Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

"সমস্ত দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঘটনা সাক্ষ্য দেয় ধর্মই মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত এবং ঘৃণাস্পদে পরিণত করেছে। ভারতীয় মানবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য কোন কিছুর যদি বেশি নষ্টামি থাকে তবে তা ধর্মের।"

—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
মোদী-শাহ অস্তিত্ব সংকটে উন্মাদ ১
দেশে বিদেশে ২
নীতিআয়োগের খসড়া ৩
মাছ বাঁচাও, মৎস্যজীবী বাঁচাও ৪
কোন অতলে আমার স্বদেশ ৫
সিআইএসএফ-এর নৃশংসতা ৬
করোনা সংক্রমণ আবার ভয়াবহ ৭
নির্বাচনী প্রচার ৮

68th Year 33th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 10th Apr. '21, 17th Apr. 2021 Joint Issue

সম্পাদকীয়

নির্বাচন কমিশন, শিতলকুচির হত্যাকাণ্ড এবং তারপর?

এবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারপর্ব শুরু হওয়া মাত্রই রাজ্যের সংবেদনশীল ও সুস্থ গণতান্ত্রিকবোধ- সম্পন্ন প্রতিটি নাগরিক আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য প্রচারক, দলের সুপ্রিমো এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একদঙ্গল দুর্বৃত্তসুলভ প্রচারকের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্ররোচনাই এই আশঙ্কার মুখ্য কারণ।

দেশ বিদেশের সমাজতাত্ত্বিক গবেষকদের গবেষণায় ও সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে গত তিন দশকে প্রাক-নির্বাচনী সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে সর্বদাই লাভবান হয়েছে বিজেপি। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি থেকে দাঙ্গা ঘটাতে যে কোনো অনৈতিক পথ বিজেপি গ্রহণ করেছে, শুধুমাত্র সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মুক্তিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে। অর্থাৎ ভোটের দৌড়ে সংখ্যাগুরুর সমর্থনে সবার আগে বিজয়স্তম্ভ পেরিয়ে যেন তেন প্রকারেন সংসদীয় ক্ষমতা দখলে এই কৌশল বিজেপিকে সর্বদাই সফলতা এনে দিয়েছে। গুজরাতের গোধরা, উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরনগর বা সম্প্রতি ২০২০ সালে দিল্লীর দাঙ্গা কোনোটাই এই সংখ্যাগুরুবাদী ফ্যাসিস্ট দলটির কাছে ব্যতিক্রমী কৌশল নয়।

সমাজতান্ত্রিকদের গবেষণায় একটি ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে। যে যেসব রাজ্যে প্রশাসনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত বেশি, সেসব রাজ্যে বিজেপি'র এই কৌশল কার্যকর হয়নি। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা সহ কয়েকটি রাজ্যে যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সংখ্যালঘু দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অধিকতর মাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে সেখানেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসনক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ধীরে ধীরে রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করে জাতপাত, আঞ্চলিক তথা সাম্প্রদায়িক সত্তার বিষয়গুলি দুর্বৃত্তপ্রধান দলটির কাছে ভোটব্যাঙ্কের কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি'র সঙ্গে যৌথভাবে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মাধ্যমে ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে নিয়ে চলে।

এবারের নির্বাচনে রাজ্যের সমস্ত আর্থ-রাজনৈতিক বঞ্চনার বিষয়গুলি অস্পষ্ট করার লক্ষ্যে অধিকাংশ প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অপরদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সমস্ত নীতিনৈতিকতা ও শালীনতা ধ্বস্ত করে ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে শুরু করে সরাসরি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের সুর চড়িয়ে চলেছেন।

তৃণমূল সুপ্রিমোর তৈরি জমির উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ থেকে দাঙ্গা ঘটানোর চেষ্টায় এবার বিজেপি তাদের সংখ্যাগুরু ফ্যাসিবাদী অনুশীলনে আরও বেপরোয়া পদক্ষেপ নিয়েছে। বিজেপি কেন্দ্রে শাসনক্ষমতার জোরে যেভাবে সংবিধানস্বীকৃত স্বাধীন সংস্থাগুলি যথা ইডি, সিবিআই, আয়কর বিভাগ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সহ বিচারব্যবস্থার ওপরেও এমনকি, আধিপত্য সৃষ্টি করেছে, সেভাবেই নির্বাচন কমিশনের সার্বভৌমত্ব হরণ করেছে। শিতলকুচির দুঃসহ গুলিচালনার ঘটনায় নির্বাচন কমিশন নিয়ন্ত্রিত আধাসামরিক বাহিনীর প্ররোচনামূলক হত্যা যে বিজেপি'র রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের জন্য সংগঠিত ষড়যন্ত্র তা নিঃসন্দেহে সত্য। ঘটনার গতিবিধি এবং বিজেপি নেতৃত্বের তীব্র বিদ্বেষমূলক বক্তব্যে তারই সাক্ষ্য মেলে। ইতিপূর্বে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন পর্বে দেশের প্রথম সারির ১৫০ জন প্রাক্তন আমলা রাষ্ট্রপতির কাছে নির্বাচন কমিশনের এই নির্লজ্জ দলদাসে পরিণত হওয়ার প্রবণতা সংশোধনের দাবি জানিয়েও কোনো ফল হয়নি।

রাজ্যের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের প্রশংসনীয় ভূমিকা যে, এই নির্লজ্জ রাষ্ট্রপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ নির্মাণ হওয়া সত্ত্বেও এখনও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারাননি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অপচেষ্টা বাস্তবায়িত হয় নি।

তবে একটি বৃহত্তর আশঙ্কার বিষয় সারাদেশের সমাজমানসকে গ্রাস করছে। তা হল রাষ্ট্রের এই অনৈতিক ফ্যাসিবাদী নীতির বিরুদ্ধে এক চরম রাজনৈতিক নিস্পৃহ সহনশীলতা। ভবিষ্যতই বিচার করবে এই নিস্পৃহ অরাজনৈতিক পরিবেশ কবে ভেঙে পড়বে। কবে ঐক্যবদ্ধ খেটেখাওয়া মানুষ এই অমানবিক রাষ্ট্রতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়াবে।

মোদী-শাহ অস্তিত্ব সঙ্কটে উন্মাদ

তৃণমূল সুপ্রিমো আবোল তাবোল বকে বাঁচার চেষ্টায় রত সংযুক্ত মোর্চার বিজয় রোধ করা অসম্ভব

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিজেপি। নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ প্রমুখর দাবি এমনই। শুধুমাত্র মোবাইল ফোনে মিসড্ কল দিলেই দলের সদস্য হওয়া যায়। অপরিসীম অর্থ বল। হবে নাই বা কেন? দেশের ধনীতম পরিবারগুলি বিজেপি'র সহায়। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে বিশেষ করে আমেরিকা ও ইংলন্ডে বহু ধনাঢ্য মানুষ এই দলটির ক্ষেত্রে বেশ দুর্বল। সম্ভবত তারা মনে করে, 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। এই মানুষটি একাই ধনকুবেরদের আরও আরও সম্পদ লিপ্সা পূরণের ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম। ২০১৯-এর পর আরও উদগ্রভাবেই পছন্দের পুঁজিপতিদের জন্য নরেন্দ্র মোদী দরাজ হস্ত। দেশের সাধারণ মানুষের একান্ত প্রয়োজনগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই আদানি-আম্বানি প্রমুখর সেবা চলতে পারে। চলছেও তাই। সংসদে নানা কারুকর্ম করে নির্দিষ্ট সংখ্যক পুঁজিপতিদের তুষ্ট করার লক্ষ্যে দেশের আইন, সংবিধান, গণতান্ত্রিক বোধ সবই জলাঞ্জলি দিতে পারে মোদী সরকার। এই সরকার তাদের অতি ক্রুর একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি নানাভাবে প্রমাণ করছে।

লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নরেন্দ্র মোদীকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসকে হতমান করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার চরম ঔদ্ধত্য বিজেপিকে আপ্লুত করে ফেলেছিল। যা তাই করার ছাড়পত্র করায়ত্ত করে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মোদী সরকার চলতে শুরু করেছিল। লোকসভায় তাঁর অনুগত স্তাবকদের নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় সরকার সবেগে চলতে শুরু করে। যে কোনো প্রতিবাদকে দেশদ্রোহিতা বলে দাগিয়ে দিয়ে বিরোধী কিংবা নিছক সমালোচনাকারীদের কারান্তরালে নিক্ষেপ করা একটি অতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। সরকার এবং রাষ্ট্রকে একাকার করে একের পর এক আক্রমণ শাণিত হয়ে চলেছে বিজেপি। একক দল হিসেবে বিজেপি'র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও দেশের সমস্ত প্রান্তের জনসাধারণের ওপর কর্তৃত্ব করতে এন ডি এ নামক একটি রাজনৈতিক জোট বিজেপিকে গঠন করতে হয়েছিল।

পাঞ্জাবের অকালি দল, গোয়ার গোমন্তক পার্টি, ফ্রিডম পার্টি, তামিলনাড়ুর ডি এম কে, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা প্রভৃতি অনেকগুলি আঞ্চলিক দল বিগত সাধারণ নির্বাচনেও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এছাড়া, অসমের অগপ, বিহারের জে ডি ইউ প্রভৃতিও প্রত্যক্ষভাবে বিজেপি'র রাজনৈতিক সঙ্গী হিসেবে জনমানসকে প্রভাবিত করেছিল। ২০১৯ এর পর থেকে মোদী সরকারের অতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক আচরণে অনেক সঙ্গীসাথী এন ডি এ পরিত্যাগ করেছে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, ভারত জুড়ে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনও এ প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

পাঞ্জাবে বিজেপি'র যতটুকু সাংগঠনিক প্রভাব ছিল তা, বিলকুল উধাও। যেকোনো নির্বাচনেই বিজেপি ধরাশায়ী। উত্তরাখণ্ড বা হিমাচল প্রদেশেও অবস্থা সঙ্গীন। সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে দ্রুত। হরিয়ানায় রাজ্য সরকারের অস্তিত্ব সংকট চলছে। দুষ্মন্ত চৌটালার দল যে কোনো সময় সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার সরকারের পতন অনিবার্য। কেরল তামিলনাড়ু বা পুডুচেরির বিধানসভা ভোটে বিজেপি পর্যুদস্ত হবেই। অসমে সোনোয়াল সরকারের ধারাবাহিক অপকর্মের বিরুদ্ধে ওই রাজ্যের মানুষ ফুঁসছে। মোদী ও অমিত শাহ নানা ধরনের প্রতারণামূলক বক্তৃতা করলেও সেই রাজ্যের নির্বাচনমণ্ডলী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। আর বিজেপি নয়। এর মধ্যে মাত্র দুতিনদিন আগেই গোয়া রাজ্যের ফ্রিডম পার্টি রাজ্য সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। গোমন্তক পার্টি আগেই সরে গেছে। মাত্র ৪০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় বিজেপির মাত্র ১৩ জন বিধায়ক। নানা কারিকুরি করেও সরকার বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। অতএব, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই শেষ ভরসা। মোদী-শাহ চক্র বেপরোয়া হয়ে শেষ চেষ্টায় মেতে উঠেছেন। ত্রিপুরায় বিপ্লব দেব সরকারও বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

এই রাজ্যে এক চরম দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরাচারী শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের এক বড় অংশের মাফিয়ারা এখন বিজেপি'র সম্পদ। বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপ্রার্থীরাই নিকট অতীতে তৃণমূল থেকে আমদানি করা নীতিহীন রাজনৈতিক সুবিধাবাদী। এইসব দুর্বৃত্তদের সঙ্গে গভীর অপরাধমূলক অপকর্মের নিবিড় যোগ। বিধানসভা নির্বাচনে চরমভাবে পর্যুদস্ত হবার আশঙ্কায় এইসব ব্যক্তিরা জার্সি বদল করে নতুন পোশাকে মানুষের দরবারে। নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই যে, বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস উভয় দলের মধ্যেই গভীর সংযোগ। দুইটি দলই ফ্যাসিবাদী মতাদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পরামর্শ অনুযায়ী চলে। বিজেপি প্রার্থীরা ভোটে জিতলে তৃণমূলের লাভ। আবার তৃণমূল জিতলে বিজেপির বিশেষ লাভ। যেকোনো সময় বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে কিনে নেবে জয়ী বিধায়কদের।

তবে রাজ্যের মানুষ অনেকেই এমন সমস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তাঁরা নিশ্চিতই ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কায় তৃণমূল নেত্রী যেমন বেপরোয়া আচরণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছেন, একই ভাবে অতি নাটকীয়তার বিকৃত বিস্তার ঘটিয়ে মোদী-শাহ চক্রান্ত ক্রিয়াশীল। বামপন্থীরা নিবিড়ভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রেখে এই নির্বাচনে দিন বদলের চেষ্টায় ঐকান্তিক ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁদের কোনো অস্তিত্ব সংকট নেই। আগামী আরও চারটি পর্যায়ে যদি শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন সংগঠিত হতে পারে তাহলে, মানুষের জয় অনিবার্য। নির্বাচন কমিশনের একদেশদর্শিতা সম্পর্কেও মানুষ সচেতন। সচেতন মানুষই নীতি আদর্শ রক্ষা করে রাজ্য ও দেশকে রক্ষা করতে পারবে।

বিরোধী নেতবৃন্দের কাছে মমতা ব্যানার্জীর বিজেপি বিরোধী মোর্চা গঠনের আবেদন

গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক নৈতিকতার তোয়াক্কা না রেখে এই বঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের পারদ এখন প্রায় তুঙ্গে। এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের একমেবদ্বিতীয়ম সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী এক ডজনের বেশি বিরোধী নেতাদের কাছে বিজেপি বিরোধী মোর্চা গঠনের আবেদন জানিয়েছেন। অভূতপূর্ব তিক্ততা সহ নির্বাচনী প্রচারের তীব্রতা যখন উচ্চতম পর্যায়ে, ঠিক সেই সময়েই এই আবেদন সম্ভবত রাজনৈতিক দুর্বলতারই পরিচয় বহন করছে অথবা আগ্রাসী ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে নতুনভাবে ছক সাজানোর জন্যই এই আবেদন। যাই হোক, মমতা ব্যানার্জীর এই চিঠিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বা রাজ্যের কোনও বিরোধী দলের পক্ষে এককভাবে বিজেপি'র মোকাবিলা করা সম্ভবত অসম্ভব—এই বাস্তবতাকেই স্বীকার করা হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জীর চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, অ-বিজেপি দলগুলির পক্ষে তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা বা সাংবিধানিক অধিকারগুলি প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। বিজেপি সারাভারতে একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যেই অগ্রসর হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জী, কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে কংগ্রেস সহ রাজনৈতিক দলের কাছে বিকল্পের সন্ধানে এক ছাতার নীচে সমবেত হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। নির্বাচনের পরে বিজেপি'র বিকল্প শক্তি গঠনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। তৃণমূল দলনেত্রী বিজেপি'র আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য রাজ্যে বা রাজ্যের বাইরেও বিজেপি বিরোধী দলগুলির সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই এই আবেদন।

প্রসঙ্গত, এই নির্বাচনী মহাযুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করলে, বলাবাহুল্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনীতির কেন্দ্রে মমতা ব্যানার্জী তাঁর আসনটি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন এবং ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে অবিজেপি পার্টিগুলির জাতীয় মোর্চার নেতৃত্ব দিতে পারবেন। আবার মমতা ব্যানার্জী পরাজিত হলে, রাজ্যে বিজেপি'র চ্যালেঞ্জের সামনে সব দলগুলির সাহায্যেরও প্রয়োজন হতে পারে।

অবশ্য কেবলমাত্র বিজেপি বিরোধিতাই এমন মঞ্চের ভিত্তি হতে পারে না। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি, ফেডারেলিজমের আদর্শ তুলে ধরার উপরও মমতার আবেদনটিতে জোর দেওয়া হয়েছে। তবে শূন্যগর্ভ আওয়াজ নয়, প্রয়োজন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি, যা জনগণের সঙ্গে বন্ধন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র নির্বাচনী পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় এমন প্রচেষ্টা হতেও পারে।

দূষণ নিষ্ক্রমণের মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনতে ভারত কেন বিরোধিতা করছে?

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত জন কেরী জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের ঘোষিত কর্মসূচিতে ভারতেরও অংশগ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য ভারত সফরে এসেছিলেন। জো বাইডেনের পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জমানায় আমেরিকা দূষণ প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেনি। জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকার জলবায়ু সম্পর্কিত নীতির পরিবর্তন হতে চলেছে। আগামী ২২ এপ্রিল বিশ্ব নেতৃত্বের শীর্ষ সম্মেলনে আমেরিকা এবং ভারতের অংশগ্রহণের মধ্যে এই দুই বড় দেশের দূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ঐকমত্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতেই বাইডেনের বিশেষ দূত ভারত সফরে এসেছিলেন।

আশা করা হচ্ছে আসন্ন সম্মেলনে ২০৫০ সাল নাগাদ আমেরিকা দূষণ নিষ্ক্রমণের মাত্রা শূন্য নামিয়ে আনার ঘোষণা করবে এবং এক্ষেত্রে তার পুরানো নেতৃত্বের আসনটি পুনরুদ্ধার করবে। ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ বেশ কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই এই শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ দূষণ নিষ্ক্রমণের মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি এবং কানাডা, দক্ষিম কোরিয়া, জাপান ZERO-EMISSION বা দূষণের মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এমনকি চিনও ২০৬০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যে অর্থাৎ ZERO-EMISSION স্তরে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের পরই দূষণ নিষ্ক্রমণকারী দেশ হিসাবে সারা বিশ্বে ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ভারত কিন্তু এখনও দূষণ প্রতিরোধ বা Greeen House গ্যাস নিষ্ক্রমণ নির্দিষ্ট মাত্রায় নামিয়ে আনার প্রশ্নে কোনও সদর্থক উত্তর দেয়নি বা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

দূষণ নিষ্ক্রমণ শূন্যে নামিয়ে আনার মানে হল যে পরিমাণ Green House Gas নির্গত হবে, বনাঞ্চল সৃষ্টি এবং নানা পদ্ধতির দ্বারা বায়ুমণ্ডলের সমপরিমাণ Green House Gas শোষণের ব্যবস্থাও করা হবে। এছাড়া বায়ুমণ্ডলকে কার্বন মুক্ত (Green House) করা এবং কার্বন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিরও ব্যবহার হবে, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এমন আশাই করছেন। ভারতের প্রতিবেশী দেশ ভূটানের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ভূটান Carbon Negative দেশ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। ভূটানে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন নির্গত হয় তার চেয়ে বেশি পরিমাণে কার্বন শোষিত হয়। বিগত দুই বছর, প্রতিটি দেশে কার্বন নিষ্ক্রমণের পরিমাণ ২০৫০ সালের মধ্যে নির্গমন ও শোষণের অনুপাত শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য জোরদার প্রচার অভিযান চলছে। প্রাক শিল্পবিপ্লব যুগের তুলনায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২° ডিগ্রীর মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা এই চুক্তিতে ধার্য হয়েছে। অথচ কার্বন নিষ্ক্রমণের বর্তমান হার বজায় থাকলে এই শতাব্দীর শেষে সারা পৃথিবীর তাপমাত্রা ৩°-৪° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাবেই। অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য হল, এই পৃথিবীতে মোট কার্বন নিষ্ক্রমণ এবং শোষণের হার আগামী তিন-চার দশকের মধ্যে সমানুপাতিক না হলে আমাদের এই পৃথিবী অন্তত মনুষ্যবাসের উপযুক্ত থাকবে না। অতএব ২০৫০ সালের মধ্যে দূষণ নিষ্ক্রমণের হার শূন্যে নামানো বিশেষ প্রয়োজন, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভরসার কথা বিশ্বের উন্নত দেশগুলি প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যমাত্রাকে মান্যতা দেওয়ার জন্য প্রায় ঐকমত্যে পৌঁছাতে সফল হয়েছে।

ভারতই একমাত্র দেশ, প্যারিস চুক্তির বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ ২০৫০ সালের মধ্যে Zero Emission এর স্তরে পৌঁছানোর বিরোধিতা করছে কারণ ভারতের শিল্পোন্নয়ন, অর্থনীতি, কৃষি সর্বত্র প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর নেতিবাচক প্রক্রিয়ার ধাক্কা সামলানো ভারতের পক্ষে সহজ হবে না। আগামি দুই তিন দশকে ভারতের কার্বন নিষ্ক্রমণের হার সারা বিশ্বের মধ্যে দ্রুততর হারেই হওয়ার কথা। কোটি কোটি ভারতবাসীর দারিদ্র মুক্তির জন্য উন্নয়নের যে হার বজায় রাখতে হবে, হাজার হাজার একর বনাঞ্চল সৃষ্টি করে বা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় কার্বন নিষ্ক্রমণ এবং শোষণের (Absorb) হারে ভারসাম্য আনা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছেন নয়া জমানার নীতি নির্ধারকবৃন্দ। নীতিগতভাবে এবং বাস্তবত ভারতের যুক্তি এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না, Green House Gas নিষ্ক্রমণের লক্ষ্যমাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনার প্রস্তাব ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে ছিল না। প্যারিস চুক্তিতে শুধু বলা হয়েছিল, প্রতিটি দেশই সাধ্যমত পৃথিবীকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন সবেমাত্র এ বছরই শুরু হয়েছে। অধিকাংশ দেশই ২০২৫ অথবা ২০৩০ সাল পর্যন্ত কার্বন নিষ্ক্রমণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

প্রসঙ্গত, একাধিক সমীক্ষায় জানা গেছে G-20 অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যার জলবায়ু নীতি এবং কর্মসূচি প্যারিস চুক্তিকে মান্যতা দিয়ে অনুসৃত হচ্ছে। এই চুক্তির মোদ্দা কথা হল তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন বা আমেরিকার তুলনায় ভারতের সাফল্য অবশ্যই সন্তোষজনক। তাছাড়া কিয়োটো প্রোটোকলের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলা যায় উন্নত দেশগুলি কিয়োটো প্রটোকলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি, বিশ্বের ধনী এবং উন্নত দেশগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফল থেকে দরিদ্র দেশগুলিকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক বা প্রযুক্তিগত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের সংশয় হয়ত বর্তমান প্যারিস চুক্তিতে ঘোষিত ২০৫০ সালের মধ্যে দূষণের হার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রারও একই পরিণতি হবে। তবে ২০৫০ বা ২০৬০ সালে এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো অসম্ভব না হলেও এখনই এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই এমনটাই মনে করে ভারত।

চিনকে ফের সতর্ক করল আমেরিকা

আমেরিকার নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের জমানাতেও চিনের সঙ্গে সম্পর্ক পরিবর্তনের কোনও লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই চিন তাইওয়ান ও ফিলিপিন্সের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের নীতি নিয়েছে। তাইওয়ানের গা ঘেঁষে চিনের যুদ্ধ জাহাজের বিরামহীন মহড়া তাইওয়ানের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলছে, মাঝে মাঝেই ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী বিমান সহ চিনা যুদ্ধ বিমান তাইওয়ানের আকাশে ঢুকে পড়ছে। একইভাবে দক্ষিণ চিন সাগরে চিনা জাহাজের চলাফেরায় ফিলিপাইন্সও যথেষ্ট অস্বস্তিতে রয়েছে। তাইওয়ানের বিদেশমন্ত্রী চিনকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। এবার দুই মিত্র দেশের সমর্থনে আমেরিকাও মুখ খুলেছে। বাইডেন প্রশাসন জানিয়েছে ফিলিপাইন্স ও তাইওয়ানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমেরিকা দায়বদ্ধ। স্পষ্ট ভাষায় বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফিলিপাইন্সে কোনও সশস্ত্র হামলা হলে বা দক্ষিণ চিন সাগরে চিন অতিরিক্ত নাক গলালে আমেরিকা ও ফিলিপাইন্সের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা পাল্টা আক্রমণ করতে বাধ্য হবে। একইভাবে তাইওয়ানকে আর্থ সামাজিক ভাবে রক্ষা করতে আমেরিকা দায়বদ্ধ। সম্প্রতি তাইওয়ান অভিযোগ করেছে, কয়েক দিন আগেই তাদের আকাশপথে ১৫টি চিনা বিমান ঢুকে পড়েছিল। যার মধ্যে ১২টিই ছিল যুদ্ধ বিমান। চিনকে পাল্টা চাপে রাখতে বাইডেন প্রশাসন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তাইওয়ান প্রণালীতে ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী আমেরিকা যুদ্ধজাহাজ মহড়া চালিয়েছে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কেন মাস্ক পরা, দূরত্ববিধি মেনে চলা আবশ্যিক

অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে, সামান্য হাঁচি, সর্দি, কাশি, মাথার যন্ত্রণা, ক্লান্তি কোনও উপসর্গই করোনা আবহে উপেক্ষণীয় নয়। এমনকি, পেটব্যথা, ডায়েরিয়াও উপেক্ষার বস্তু নয়। ব্রিটেনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পূর্ণ উপসর্গহীন করোনা পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে ব্রিটেনে। সমস্যা হল, সম্পূর্ণ উপসর্গহীন অথচ করোনা সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, যারা নিজেরা কাহিল না হলেও অজান্তেই পাশের মানুষকে আক্রান্ত করতে পারেন, তাই মাস্ক পরা, দূরত্ব বিধি মেনে চলতেই হবে।

পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তি সত্ত্বেও নদী সংযুক্তিকরণের কাজ চলছে

কেন-বেতওয়া নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের কোনও প্রয়োজন নেই। ভুল তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত কেন-বেতওয়া সংযুক্তিকরণ প্রকল্পটির কাজ আইনি প্রতিরোধ উপেক্ষা করেই চলছে। নিঃসন্দেহে এই প্রকল্প বুন্দেলখণ্ডের অপূরণীয় ক্ষতিই করবে। বুন্দেলখণ্ডের মানুষের জলের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু ৩৮০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান কেন-বেতওয়া সংযুক্তিকরণ প্রকল্প (Ken-Betwa Link Project) বুন্দেলখণ্ডের জলের সমস্যা সমাধানের এক মাত্র উপায় হতে পারে না। এই প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ হলে এর নেতিবাচক প্রভাব সমগ্র অঞ্চলের উপরই পড়বে। সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত বিশেষ কমিটির (Central Empowered Committee) রিপোর্টে এই প্রকল্পের সমর্থনে Wild Life Clearance শংসা পত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। KBLP প্রায় ১০,৫০০ হেক্টর জমিতে বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবে। Upper Betwa Basin জলের ঘাটতি পূরণই ছিল এই প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। Upper Betwa Basin বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ওই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বুন্দেলখণ্ড অপেক্ষা বেশি। তাছাড়া বুন্দেলখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চলেই অন্যান্য একাধিক প্রকল্প থেকে জলের সরবরাহ রয়েছে। এই প্রকল্পগুলিকে সামান্য সংস্কার করেই সমগ্র এলাকায় যা কিছু ঘাটতি আছে তা পূরণ করা সম্ভব। অনেক কম খরচেই এই কাজটা করা সম্ভব হতে পারত। বনাঞ্চল সংরক্ষণের উপদেষ্টা কমিটি (FAC) এবং সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত (CEC) -র অভিমত, National Water Development Agency (NWDA) সম্ভবত কেন-বেতওয়া সংযুক্তিকরণ প্রকল্প (KBLP) -র বিকল্পের যথাযথ সমীক্ষা করে উঠতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলা যেখানে চিরস্থায়ী জলের সমস্যা রয়েছে, এই KBLP দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, বরং এই প্রকল্প পান্না জেলায় বাস্তুতন্ত্রের বিপুল ক্ষতিসাধন করবে এবং এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলাতেও অপূরণীয় ক্ষতি সহজে পূরণ হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত Central Empowered Committee (CEC) মারাত্মক অভিযোগ করেছে Upper Ken Basin -এ জলের ঘাটতি পূরণের সমস্যার সমাধান KBLP করতে পারবে না। প্রকল্প রচয়িতারা উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলকে বরাবরের জন্যই অনুন্নত অবস্থায় রাখতে চান। এই প্রশ্ন সংগতকারণেই করা যেতে পারে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নীতিআয়োগের খসড়া : চোখে ধুলো দেওয়ার রাষ্ট্রিক প্রকল্প

পার্থসারথি দাশগুপ্ত

দ্বিতীয়বার দ্রুত করোনার আগ্রাসন দেশবাসীকে গত বছর ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই ভয়ঙ্কর অকস্মাৎ লকডাউন ঘোষণার দুঃসহ স্মৃতির বেদনাকে জাগিয়ে তুলছে। একটি রাষ্ট্রিক এবং অবমূল্যকারী ঘোষণা সেদিন ঘরছাড়া, অন্য রাজ্যে, অন্য জেলায়, গ্রাম থেকে শহরে কাজ করতে যাওয়া অসংগঠিত ক্ষেত্রে খেটেখাওয়া মানুষের কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডেকে এনেছিল আজও ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়। সস্তা শ্রমের বাজারে ভিড় করা অসহায় মানুষগুলো ভাবতেই পারে নি কিভাবে যাবে, যেতে না পারলে কোথায় থাকবে, হাজার কিলোমিটার দূর থেকে দেশগাঁয়ের বাড়িতে ফিরতে গেলে কে তাদের পাশে দাঁড়াবে। কোনো যানবাহন নেই, পরিবার নেই, দুঃসহ গ্রীষ্মে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে লক্ষ লক্ষ মানুষ পায়ে হেঁটেই অজানা পথে ঘরমুখো হল। তপ্ত পিচ ঢালা রাজপথ, সূর্যের তীব্র তাপে ঝলসে ওঠা রেললাইন ধরে, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষার ঘনজঙ্গল পেরিয়ে দিনের পর দিন হাঁটতে থাকল ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ মানুষ।

একটি সময় গণবিদ্রোহের আশঙ্কায়, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কিছু ট্রেন চলতে শুরু করলেও, এই সব পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা এবং দুর্ব্যবহার তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিল চূড়ান্ত অমানবিক ব্যবস্থার মধ্যে। এছাড়া যে সব রাজ্য থেকে এইসব খাদ্যহীন, বাসস্থানহীন মানুষগুলি নিজের বসতবাড়ির দিকে যাত্রা করেছিল, কারখানা বা নির্মাণকার্যের মালিক এবং ঠিকাদাররা তাদের হাতে ন্যূনতম অর্থ দিয়েও সাহায্য না করায় অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এদের সঙ্গে ছিল আরও কয়েক লক্ষ মানুষ, যারা হকারি করছে বা রাস্তা মেরামতের কাজ করছে অন্য রাজ্যে গিয়ে। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে ফুটপাথই যাদের আশ্রয়, তারাও শামিল হল এই ঘরমুখো মহামিছিলে।

ভারতের মতো বিশাল দেশ, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসম পুঁজিবাদী বিকাশ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন, সেখানে এই সব নিজের গ্রাম, জেলা, রাজ্য ছেড়ে আসা সস্তা শ্রমের মানুষের শ্রম যে কি বিপুল ভূমিকা নেয়, এতদিন যেন সরকার এবং কারখানার মালিকরা চোখ বুঁজে ছিল। আচমকা দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক ভাবে দেশের সক্রিয় শ্রমশক্তির অনুপস্থিতিতেই বিষয়টা যেন স্পষ্ট হল এদেশের পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের পরামর্শদাতা অর্থনীতিবিদদের কাছে।

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই দেশের ঐতিহ্যশালী পরিকল্পনা কমিশন অবলুপ্ত করা হয়। মূলত দেশের পুঁজিবাদী বিকাশের লক্ষ্যেই পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হলেও, দেশের জাতীয় আন্দোলন প্রসূত গণতান্ত্রিক উন্নয়নের ভাবনাচিন্তার বহু ইতিবাচক উপাদানে সমৃদ্ধ ছিল সংস্থাটি। আগ্রাসী নয়াউদারবাদী অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তিটা, আরও পাকাপোক্ত করতে প্রথম এন ডি এ সরকারের শাসনকালেই মুখ্যত নয়াউদারবাদী ব্যবস্থার প্রচারক অর্থনীতিবিদের দলবল এবং কর্পোরেট সংস্থাসমূহের প্রাক্তন ও বর্তমান পরিচালকদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ধ্বংসস্তূপের উপর তৈরী হল নীতি আয়োগ। এই নীতি আয়োগের সমস্ত সুপারিশই হল দেশিবিদেশি কর্পোরেট পুঁজির আরোগ্যলাভ, স্থায়ীত্ব এবং সম্ভব হলে বিকাশের পথ মসৃণ করার লক্ষ্যে।

এরাই পরামর্শ দিয়েছে মানুষ মারা কৃষি আইন, চারটি শ্রম কোড, সর্বজনীন লিজ দলিলের নীতি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রসহ ব্যাঙ্ক বীমা বেসরকারি পুঁজির কাছে সমর্পণ করতে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, নির্মলা সীতারমন প্রমুখ সংঘ পরিবারের নেতৃত্বের নিজস্ব সাংগঠনিক বক্তব্য শুধুমাত্র সংখ্যালঘু বিতাড়ণ, হিন্দুরাষ্ট্র গঠন ইত্যাদি সামাজিক বিষবৃক্ষের জলসিঞ্চন করার জন্য। আর অর্থনীতি বিষয়ে এদের সমস্ত স্বরক্ষেপন করেন এইসব নীতি আয়োগের আগ্রাসী নয়াউদারবাদী অর্থনীতির সেবক ও পাহারাদার পণ্ডিতকুল।

স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের নয়াউদারবাদী আগ্রাসী প্রকল্পের মস্তিষ্কস্বরূপ নীতি আয়োগের উপর দায়িত্ব পড়ল, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একটি জাতীয় নীতির খসড়া প্রস্তুত করতে হবে। নীতি নির্ধারক অর্থনীতিবিদদের একজন প্রধান ব্যক্তির বক্তব্য যে, এই বিষয়ের উপর জাতীয় নীতি নির্ধারণের প্রধান কাজ হল কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সমূহের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ এবং তথ্যের আদানপ্রদানের ভিত্তিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দরকার।

খসড়া প্রস্তাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর একটি তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত অসংগঠিত শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের দাবিদাওয়া এবং উপযুক্ত বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনবীমা, বাসস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবার পরিসরে কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখ, যা লকডাউন পর্যায়ে জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই খসড়া নীতিতে প্রতিফলিত হয় নি।

শুধু তাই নয়। মুম্বাইয়ের মাইগ্রেশন এ্যান্ড আর্বান স্টাডিজ এ্যাট দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের বিভাগীয় প্রধান আর বি ভগত মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে একটি সামগ্রিক নীতি গ্রহণের চেষ্টা করছে একথা সত্য। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত ঘরছাড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটের অধিকার, বিভিন্ন রাজ্যে শ্রম আইন কিভাবে এদের উপর কার্যকর হবে, তাদের বাসস্থানের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হবে, খসড়া প্রস্তাবে এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিন্দুমাত্র উত্থাপিত হয়নি। এই সংকীর্ণ ও অসমাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খসড়া প্রস্তাব মুক্ত না হলে বাস্তব ক্ষেত্রে এই খসড়া প্রস্তাব পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের কোনো পথ দেখাতে পারবে না।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিযুক্ত করার দায়িত্বে ঠিকাদারদের অধিকাংশ সংগঠনের বক্তব্য, যে নীতি আয়োগের এই নীতি নির্ধারণের জন্য খসড়া প্রস্তাব অবশ্যই একটি শুভ উদ্যোগ। কিন্তু লকডাউন ধীরে ধীরে প্রত্যাহৃত হওয়ার পরে বিভিন্ন কোম্পানীর মালিকরা যে দ্রুততা এবং গুরুত্বের সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে, আচমকা লকডাউন শুরু হওয়ার সময় কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজেদের বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য ন্যূনতম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়ে তাদের মজুরি, এককালীন কিছু অর্থ বা যাতায়াতের ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে নি। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে শ্রমিকদের কাজের জায়গার রাজ্যগুলির সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগের ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে নি। শুধুমাত্র নির্মাণকর্মীদের জন্য ১৯৯৬-এর আইনটি কোনো কোনো রাজ্যে অনুসৃত হয়েছে মাত্র। নীতি আয়োগের সুপারিশগুলি উপর উপর দেখতে গেলে সমস্যাগুলিকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার আভাস সুস্পষ্ট। যেমন খসড়া নীতিতে বলা হয়েছে পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রক, হাউজিং এ্যান্ড আর্বান এ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল এ্যাফেয়ার্স-এর মন্ত্রকগুলি একত্রে দেশান্তরী হওয়ার উৎস সংক্রান্ত তথ্য ভাণ্ডার গঠন করবে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী যাতে নিজেদের রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র না যায়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মসংস্থান এবং ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার দেশ গাঁ ছেড়ে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানসন্ততিরা যেন অন্য রাজ্যে এসে শিক্ষার অধিকার ২০০৯ এর আইনের সুযোগ পায়, সেই দিকে সরকারকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি যাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাত্রিবাস করার জায়গা বা স্বল্পকালীন বসবাসের উপযুক্ত জায়গা নিশ্চিত করতে পারে, এই বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং মিনিস্ট্রী অফ লেবার যাতে শ্রমিক কর্মচারীদের অভিযোগগুলির সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে, তার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের আইনী সহায়তা করার জন্য 'সেল' গঠন করতে হবে।

২০০৭ সালে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থা সম্বন্ধীয় রিপোর্টএবং ২০১৭ সালে হাউজিং এ্যান্ড আর্বান পোভার্টি এ্যালিভেশন মন্ত্রকের রিপোর্টকে এই নীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ এর রিপোর্টে প্রসঙ্গক্রমে লকডাউনের পর্যায়ে ১৯৭৯ সালের আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের আইনটির সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিভিন্ন মহল, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে। শুধুমাত্র যেখানে ঠিকাদাররা শ্রমিকদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজের জন্য নিয়ে যায়, সেইসব ক্ষেত্রে মজুরির বৈষম্য, যাতায়াতের খরচ, সহনীয় কাজের পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের কিছু নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকাল যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক কোনো না কোনো যোগাযোগের সূত্রে নিজেরাই সরাসরি দেশান্তরী হচ্ছে। তাদের ক্ষেত্রে কোনো সুরাহার সুপারিশ ১৯৭৯-এর আইনেও ছিল না। অর্থাৎ এই খসড়া প্রস্তাবে শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকারের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে অধিকার সমূহকে আইনে রূপান্তরিত করা যায় খসড়ায় তার কোনো দিশা নেই। এমনকি সুসম লেবার কোডও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব

এই ধরনের খসড়া প্রস্তাবে দিস্তা দিস্তা কাগজের উপর অনেক সুপারিশ, অনেক তথ্য এবং তত্ত্ব রচিত হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। বরঞ্চ লক্ষ করা গেছে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফের সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়ে পুঁজিবাদী পরিকাঠামো উন্নয়নকে ভিত্তি করে এদেশে দ্রুত আধুনিক নগরায়ণের প্রবণতা শুরু হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের একাংশ তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন এই নগরায়নের ফলে জিডিপি'র অবদান বৃদ্ধি ১৯৮০-৮১ সালে ৪৭ শতাংশ থেকে ২০৩০ সালে ৭৫ শতাংশে পৌঁছুবে।

কর্পোরেট নগরায়নের স্কীম যথা JNNURM AMRVT, স্মার্ট সিটি নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়ণে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, সেই নিজের গ্রাম শহর ছেড়ে আসা পরিযায়ী মানুষদের অবস্থা কার্যতই প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো। সমস্ত ধরনের সামাজিক সুরক্ষা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য পরিষেবার থেকে বঞ্চিত অন্ধকার ভারতের অধিবাসী এইসব হতভাগ্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের খেটেখাওয়া মানুষ। কোনো তথ্যভাণ্ডার যেমন এদের জন্য তৈরি হয়নি, যে রাজ্য থেকে এরা অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে, উভয় রাজ্যই এদের বাড়তি জনসংখ্যা বলে অবহেলিত করেছে। এদের ধেকে অর্জিত উদ্বৃত্তমূল্যের পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছে দেশি বিদেশি কর্পোরেট বাহিনী।

আমাদের দেশে শ্রমজীবী শ্রেণির দেশান্তরী বা পরিযায়ী সত্তার ইতিহাস অবশ্যই প্রাক ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে শুরু করে আধুনিক ১৯৯১ সাল থেকে চলমান নয়াউদারবাদী অর্থনীতির বিকাশের ধারাবাহিকতার ফসল। দেশের স্বাভাবিক আর্থসামাজিক ঐতিহ্য ছিন্ন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্রুত আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন, কৃষির পণ্যায়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে রপ্তানী-আমদানী নীতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। স্বাধীনোত্তর যুগেও দেশীয় পুঁজিবাদ নিজস্ব ধরনে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অঙ্গীভূত হওয়ার পথ খুঁজে নিচ্ছে নিরন্তর।

সুতরাং অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণই হোক, রাস্তাঘাট, রাজপথ সহ অটোমোবাইল শিল্পের বাড়বাড়ন্তই হোক, কৃষিতে কৃষি ব্যবসায়ীর আগ্রাসনই হোক; বেসরকারিকরণ বিলগ্নীকরণই হোক, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বাণিজ্য অঞ্চলের নির্মাণই হোক—স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা এবং তাদের অধিকার ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। বাড়ছে অস্থায়ী, অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা।

এককথায় বলা যায়, শুধুমাত্র একটি বিশেষ আমলাতান্ত্রিক এবং নয়াউদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই দেশান্তরী বা পরিযায়ী বা প্রবাসী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

কে হিসেব রাখবে কৃষিতে আধুনিকীকরণের পাশাপাশি খুচরো ও পাইকারী ব্যবসায় কৃষি হাঙ্গরদের ঢালাও অনুপ্রবেশ ও বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও ডেয়ারী উৎপাদনের ধরন বদল, প্রস্তাবিত কৃষি আইনের করাল গ্রাসে আরও কত কোটি মানুষ উৎপাদনের উপকরণ ও সামান্য জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, উৎখাত হবে।

তাই অভ্যন্তরীণ যাযাবর বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হওয়া মানুষের প্রকৃত সংখ্যা, কোন ধরনের বৃত্তি থেকে চ্যুত হয়ে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে, কত মানুষ নতুন নতুন খনিতে আকরিক খনন করছে, কোথায় আদিম পুঞ্জীভবনের লক্ষে হাজার হাজার আদিবাসী ঘরবাড়িচ্যুত হয়ে জীবনধারণের জন্য নিজের দেশগাঁও ছাড়ছে, সে হিসাব রাখা ও পরিযায়ী/দেশান্তরী মানুষের সমস্যা সমাধান শুধু কাগজে আর কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে লিপিবদ্ধ থাকবে। এর বেশী নয়।

খাদ্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে জল বাঁচাও, মাছ বাঁচাও, মৎস্যজীবী বাঁচাও

অশোক ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের তিরিশ লক্ষের উপর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী নদী-সমুদ্রে মাছধরা, বিল-পুকুরে মাছ চাষ, মাছ শুকানো, বিক্রি ইত্যাদি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সমুদ্রের উপকূলে ঘর বেঁধে, খটি তৈরি করে, উত্তাল ঢেউ আর ঝড়-বাদলের সাথে লড়াই করে অথবা নদী-জলায় দিনরাত পড়ে থেকে এঁরা মাছ ধরেন। ছোট ছোট পুকুর লিজ নিয়েও এঁরা মাছ উৎপাদন করে থাকেন। অমানুষিক পরিশ্রমে এঁদের দিন গুজরান হয়। এতে যে শুধু এই পেশায় যাঁরা যুক্ত তাঁদের পেট চলে তাই নয়, সমাজের মানুষ মাছ খেতে পায়। মৎস্যক্ষেত্রে কাজ করেন প্রায় ৪ কোটি মৎস্যকর্মী যাঁদের অন্তত অর্ধেক মহিলা। সরকারি হিসেবে এদেশে বছরে ১৪০ লক্ষ টনের উপর মাছ উৎপন্ন হয়, দেশের ৮০ কোটি মানুষ মাছ খেয়ে থাকেন। আর বিদেশের বাজারে মাছ রফতানি করে অর্জিত হয় ৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। দেশের মানুষের খাদ্য সুরক্ষায় ও পৌষ্টিক মান বজায়ে, কর্মসংস্থানে, অর্থনীতিতে মৎস্য কর্মীদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা।

অথচ কি ভয়াবহ অবহেলা, বঞ্চনা আর অবিচারের শিকার এই মৎস্যজীবীরা! সাগরমেলা প্রকল্পে উপকূল জুড়ে বন্দর তৈরি হচ্ছে, বড় বড় পর্যটন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য শিল্প উপকূলের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করছে। মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বড় বড় যান্ত্রিক মৎস্যশিকার যান বা ট্রলার লুঠ করে নিচ্ছে। শতাধিক নদীতে ব্যাপকভাবে মাল পরিবহণের জন্য জাতীয় জলপথ ঘোষিত হয়েছে। চলছে ড্রেজিং। দূষণ, অকাতরে জল তুলে নেওয়া ও জবরদখল নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয়ের জল ও মাছ ধ্বংস করছে। উৎখাত হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী। ক্রমেই সরকারি ও বেসরকারি জলাশয় ক্ষুদ্র দরিদ্র মৎস্যজীবীদের হাত থেকে ধনী বিনিয়োগকারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। বেআইনি চিংড়ি ফার্মগুলি জল, মাটি দূষিত করছে। তথাকথিত উন্নয়ন বা সংরক্ষণের নামে মৎস্যজীবীদের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র বা কাজের জায়গাগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। জম্বুদ্বীপ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। মৎস্যজীবীদের বসত বাড়িগুলির অধিকাংশই পাট্টাহীন, এবং তার সুযোগ নিয়ে উন্নয়নের নামে তাঁদের গৃহহীন করার চক্রান্ত উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নৌকা রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকায় আঘাত হানা হয়েছে। সুন্দরবনে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকা বন্ধ করা হয়েছে ও হচ্ছে। আর নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের নামে জেলেদের উপর বন দফতরের অত্যাচার উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। মৎস্যজীবীদের জন্য বনবাসী অধিকার আইন প্রয়োগ হয় না। সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত জেলেদের বিধবারা নিদারুণ দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন—সরকারি সহায়তা, ক্ষতিপূরণ বা বিমার অর্থ তাঁরা পান না। খাটি কর্মচারীরা বছরের পর বছর পরিষেবা দিয়ে গেলেও তাঁদের স্থায়ীকরণ হয় না। মৎস্য সমবায়গুলির বেশিরভাগই অকেজো। সুন্দরবনের আদিবাসী মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার উদাসীন। লক্ষ লক্ষ মৎস্য ভেন্ডার আর্থিক সংস্থান, পরিকাঠামো ও উপযুক্ত বাজারের অভাবে ভুক্তভোগী। দেশের মোট মৎস্যজীবীর শতকরা ৫০ ভাগের বেশি মহিলা অথচ তাঁদের উন্নয়নের জন্য কোনও বিশেষ সরকারি প্যাকেজ বা স্কিম নেই।

কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদের জেরে মৎস্যজীবীদের দুর্ঘটনা বিমা এ রাজ্যে বন্ধ, বন্ধ হয়ে আছে মাছ ধরা বন্ধ থাকার সময়ের সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পের জীবিকা সহায়তা। জীবন বিমার সংস্থান নেই। মৎস্যজীবীদের জন্য যেটুকু জাল-নৌকো, সাইকেল, ঠাণ্ডা বাক্সের সরকারি সহায়তা আসে তাও রাজনৈতিক দলবাজিতে প্রকৃত অভাবি মৎস্যজীবীদের কপালে জোটে না। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বা প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদ যোজনা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। আমফান সাইক্লোনের সরকারি ক্ষতিপূরণের ব্যাপক অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য কেন্দ্রের এন সি ডি সি প্রকল্পে ভরতুকি বা সাবসিডির অর্থ ব্যাপকভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

ধারাবাহিক বঞ্চনা, অবহেলা ও দুর্নীতির জন্য মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত আহত এবং ক্ষুব্ধ। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের মৎস্যজীবী ফোরাম পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দাবি করছে।

চাই পেশাগত মর্যাদার স্বীকৃতি:

মৎস্য শিকারী (জেলে), মৎস্য চাষি, মৎস্য ভেন্ডার, মাছ বাছাই ও শুকনো কর্মী নির্বিশেষে প্রতিটি মৎস্যকর্মীকে মৎস্যজীবী ইউনিয়ন বা সমবায়ের শংসাপত্রের ভিত্তিতে তার পেশাগত মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে সরকারি পরিচয়পত্র দিতে হবে। সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিটি ছোট মাছ ধরা (৩০ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত) নৌকোর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

চাই সুস্থায়ীভাবে জলাশয় ব্যবহারের অধিকার :

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সাথে জলাশয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জল যেখানে জেলে সেখানে।

—ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারীদের (জেলেদের) সমুদ্র, নদী, খাল, জলাধার, জলাভূমিতে সুস্থায়ীভাবে মাছ ধরার অবাধ অধিকার (পাট্টা) দিতে হবে।

—সুন্দরবন সহ সব সংরক্ষিত এলাকার নদী ও জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার দিতে হবে। এফ পি সি বাতিল করে জেলেদের নিয়ে বনাধিকার কমিটি গঠন করতে হবে।

—সমস্ত চাষযোগ্য সরকারি জলাশয়ে স্থানীয় ক্ষুদ্র মৎস্যচাষিদের মাছ চাষের পাট্টা দিতে হবে, লিজ প্রথা বাতিল করতে হবে।

—ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুরের লিজের ভাষা নির্ধারণ ও বৃদ্ধি নির্ধারণ করতে হবে এবং লিজ গ্রহীতা মৎস্যচাষিকে উৎখাত বিরোধী সুরক্ষা দিতে হবে।

চাই মৎস্য কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অধিকার :

—প্রতিটি সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জমির আইনি অধিকার মৎস্যজীবীদের দিতে হবে।

—কোনও মৎস্য ভেন্ডারকে মাছ বিক্রির স্থান থেকে সম্মতি ও উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া উৎখাত করা যাবে না।

—জম্বুদ্বীপে মৎস্যজীবীদের মাছ শুকানোর অধিকার অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে।

চাই জলাশয় ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার অধিকার :

—ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জল, জলাশয় ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য দূষণ, দখলদারি, অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার সহ সমস্ত ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দিতে হবে।

—ট্রলিং, মশারি জাল, বিষ দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

—মৎস্য সুরক্ষার স্বার্থে ৩০ হর্সপাওয়ারের বেশি মৎস্যযান ও ট্রলিং সহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক মৎস্যযানগুলির নতুন রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করতে হবে ও তাদের কোনও প্রকার সরকারি আর্থিক সহায়তা না- দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

—ট্রলনেট ব্যবহারকারী ট্রলি (ট্রলার)গুলিকে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য বন্দর বা ঘাট ব্যবহার করতে দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

চাই দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন :

মৎস্যজীবী প্রকল্পগুলির লাভ যাতে রাজনৈতিক পক্ষপাতহীন ও দুর্নীতি ছাড়া প্রকৃত অভাবি মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এন সি ডি সি প্রকল্পের ব্যাপক দুর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। মৎস্যজীবীদের নানাবিধ অভাব-অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও মৎস্যজীবী ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে ব্লক স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে।

চাই আর্থিক সংস্থানের অধিকার:

প্রতিটি মৎস্যজীবীকে জীবিকার জন্য সুলভে ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে হবে। এর জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা সহ প্রয়োজনীয় প্রকল্পের ব্যবস্থা করতে হবে। মৎস্যজীবী সমবায়, মৎস্য উৎপাদক ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা দিতে হবে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদনের রীতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

চাই পরিকাঠামোর অধিকার :

মৎস্যজীবীদের জন্য সুলভে জাল-নৌকার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে রাস্তা, মাছ শুকানোর চাতাল, পানীয় জল, আলো, শৌচাগার, বিশ্রামাগার ও গুদামঘর সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। নদীর ঘাটে প্রয়োজনানুসারে, জেটি, বাঁধানো ধাপ, আলো ও রাস্তা করতে হবে। মৎস্যভেন্ডারদের জন্য সাইকেল, ঠান্ডা বাক্স ও বাজার সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ব্যবস্থা করতে হবে।

চাই সামাজিক সুরক্ষার অধিকার:

ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীদের জীবন, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য বিমা দিতে হবে। অবিলম্বে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর জন্য ৫ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ ইনস্যুরেন্স চালু করতে হবে। অবিলম্বে ৩০ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত মাছ ধরা নৌকার ফ্রি-ইনস্যুরেন্স চালু করতে হবে। আবাসন ; বয়স্ক, অক্ষম ও বিধবা ভাতা সহ পূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

চাই মহিলা মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার :

১. মহিলা মৎস্যকর্মীদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে একটি সর্বার্থসাধক বিশেষ প্রকল্প চালু করতে হবে এবং মৎস্যজীবীদের জন্য চালু সাধারণ প্রকল্পগুলিতে মহিলা মৎস্যকর্মীদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২. (ক) সুন্দরবনের ব্যাঘ্র বিধবাদের (টাইগার-উইডো) চিহ্নিতকরণের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করতে হবে এবং প্রতিটি ব্যাঘ্র বিধবাকে ক্ষতিপূরণ ও বিমার অর্থ সহ মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা দিতে হবে।

(খ) অবিলম্বে সকল মৎস্যজীবী সমুদ্র-বিধবাকে (মেরিন উইডো) সরকারি ভাতা প্রদান করতে হবে।

চাই খাটি কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ:

উপকূলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলিতে (খটির) সরকার নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে।

বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থী

২৭ মার্চ, ২০২১

১) **ছাতনা** — কম. ফাল্গুনী মুখার্জী

১ এপ্রিল, ২০২১

২) **গোসাবা (এস সি)** — কম. অনিল চন্দ্র মন্ডল

৬ এপ্রিল, ২০২১

৩) **বাসন্তী (এস সি)** — কম. সুভাষ নস্কর

১০ এপ্রিল, ২০২১

৪) **কুমারগ্রাম (এস টি)** — কম. কিশোর মিনজ্

৫) **মাদারিহাট (এস টি)** — কম. সুভাষ লোহার

১৭ এপ্রিল, ২০২১

৬) **ময়নাগুড়ি (এস সি)** — কম. নরেশচন্দ্র রায়

২৬ এপ্রিল, ২০২১

৭) **জঙ্গীপুর** — কম. প্রদীপ কুমার নন্দী

৮) **কুশমন্ডি (এস সি)** — কম. নর্মদাচন্দ্র রায়

৯) **তপন (এস টি)** — কম. রঘু ওরাওঁ

১০) **বালুরঘাট** — কম. সুচেতা বিশ্বাস

২৯ এপ্রিল, ২০২১

১১) **বোলপুর** — কম. তপন হোড়

কোন অতলে আমার স্বদেশ

মনোজ ভট্টাচার্য

যেমন তেমন করে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালকদের অন্যতম চারিত্র বৈশিষ্ট্য। সারা বছর জুড়েই এদের এমন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চলতেই থাকে। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারলে শাসকদের প্রকৃত রূপটি পরিষ্কার ধরা পড়ে যাবে। মানুষ শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি করতে পথে নামবে। যত কম সংখ্যক মানুষ এমন দাবি নিয়ে পথে নামেন ততই মঙ্গল শাসকশ্রেণির। নানা কলকাঠি নেড়ে বিচিত্র সব কথার জাল বুনে সাধারণ জীবনের চলমান দুর্দশার প্রকৃত কারণ গোপন করতে না পারলে শুধু শাসকদলের পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে উঠবে এমন নয়, যে ব্যবস্থার জন্য প্রতিনিয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনচর্যা বা জীবন ধারণ সমস্যাসংকুল হয়ে পড়ে তার আমূল পরিবর্তন এবং নতুন এক পরিবর্তিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার আকুতি বিপুল বেগে বেড়েই চলবে। বিপদটা সেখানেই। আর যাই হোক, চলমান আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে যে কোনভাবে রক্ষা করাই শাসক দলগুলির একমাত্র অভীষ্ট।

এই মৌলিক প্রসঙ্গটি সাধারণভাবে বা স্বাভাবিক সময়ে খুব বেশি আলোচনায় উত্থাপিত হয় না। হলেও, তা একান্তভাবেই অল্পসংখ্যক মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে কিছুকাল তাঁদের সমাজবোধকে আচ্ছন্ন করে। বিশেষ তাৎপর্যবাহী গণ আন্দোলনের প্রসার না ঘটলে একসময় সেই আচ্ছন্ন ভাবটিরও সমাজ পরিসরে তেমন কোনো রেশ থাকে না। কালের গর্ভে হারিয়ে যায়।

একথা সত্য যে, যে কোনো গণআন্দোলনই জনসমাজের একাংশকে প্রভাবিত করে। অনেকেই তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সেই শিক্ষা জীবনে কেউ গ্রহণ করেন। আবার কেউ সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখায় পরিবর্তন বা পরিমার্জনের ব্যবস্থাও নেন। এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দাবি নিয়ে অতীতে যেসব গণ আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনোজগতে পরিবর্তনের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি থেকে দেশের শাসককুলও বিলক্ষণ শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। তারা পথ সন্ধান করে তেমন পরিস্থিতি যেন পুনরায় উদ্ভূত না হয়।

এমন পথসন্ধান নিতান্তই মুখ্য প্রসঙ্গ থেকে দৃষ্টি অন্যত্র নিয়ে যাবার ছিল ছলচাতুরিতে পরিপূর্ণ হয়।

এইভাবে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার স্বাভাবিক সংকট বা সমস্যাগুলির পুনরাবর্তন এড়িয়ে চলা মোটেই সহজ নয়। শাসক দল বা প্রকৃত অর্থে শাসকশ্রেণি তা চাইলেও সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, রাজনীতি যেহেতু অর্থনীতির সারাৎসার মাত্র অতএব, অর্থনৈতিক অবস্থার রকমফের সর্বদাই রাজনীতিকে প্রভাবিত করে চলে। শাসক দলের অনুগত কিংবা অনুগ্রহ প্রাপ্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা বহুভাবে চেষ্টা করেও সংকটকালীন সময়ে শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন সম্ভব না করতে ব্যর্থ হন। সংকটকালীন সমস্যাগুলির প্রতিরোধে গণআন্দোলনও অনেক সময় পুনরাবর্তন ঘটায়। এমন নয় যে, একই আঙ্গিকে আন্দোলনগুলির পুনরাবর্তন ঘটে চলে। আঙ্গিক বা ফর্ম পৃথক হতেই পারে। লক্ষ্য অভিন্ন। শ্রেণি শাসনের যাঁতাকলে পড়ে যাঁরা যুগযুগান্ত ধরে নিষ্পিষ্ট হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে পাল্টে ফেলার আকুতি তীব্রতর হয়।

গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী দলসমূহ কিংবা প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনার মানুষদের কর্তব্য উল্লিখিত আকুতিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা। ইতিহাসে নানা সময়ে এমন অনেক ঘটনার উদ্ভব ঘটে যা, তাৎপর্যপূর্ণ। সবসময়েই সেইসব তাৎপর্যবাহিত সংঘটনগুলি যে যথাযথ পরিবর্তন সূচিত করতে পেরেছে তা নিশ্চয়ই নয়। বরঞ্চ বলা ভাল, অনেক বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেইসব ঘটনাবলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বা বিপরীত পথে প্রবাহিত হয়ে সাধারণ মানুষের আবেগসম্পন্ন আকুতির সঙ্গে বিশ্বাস হন্তারকের দুঃখজনক পরিণতিতে পর্যবসিত হয়েছে। 'কালের কপোলতলে একবিন্দু জল শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়েই তা ক্রমে হারিয়ে গেছে। সাধারণের অধিকাংশের স্মৃতিতেই তা আবছা বা ধূসর হয়ে পড়ে। এটাই শাসকদলের বিশেষ সুবিধা। তারা মানুষের বিস্মৃতির ওপর নির্ভর করেই নিত্যনতুন ফন্দিফিকির তৈরি করে নতুনভাবে মানুষকে প্রতারিত করার সুযোগ নেয়। এ যেন প্রবহমান এক ধারা।

(দুই)

আমাদের দেশে যে ধরনের গণতন্ত্র চালু রয়েছে তা বারংবার সেদিকেই ইঙ্গিত করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা শাসক দলগুলির প্রচার, প্রক্রিয়া প্রকরণ সবকিছুই মানুষকে ধোঁকা দেবার নতুন নতুন কৌশল। নব নব রূপে। এত অসত্য বা নির্জলা মিথ্যা প্রচারের উচ্চনিনাদ অনবরত সাধারণ মানুষকে বা বঞ্চিত মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল।

দক্ষিণপন্থী দলগুলির নেতা নেত্রীরা যে এমন নির্বিকার চিত্তে অনবরত মিথ্যা বলেই যান তা, তাঁদের কোনও বৈশিষ্ট্যই নয়। এমন নির্দেশ আসে অনেক ওপর থেকে। তাদের আমরা সাধারণভাবে দেখতেই পাই না।

তাৎপর্যপূর্ণভাবেই শাসক দলগুলির এমন প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে প্রবলভাবে জড়িত রয়েছে মূলধারার গণমাধ্যমগুলি। ক্ষুদ্রাংশ হলেও এক ধারার সংবাদপত্রগুলিতে যদিও অন্যদিকও লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি এই সুযোগে প্রাণভরে অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় মেতে রয়েছে। কে কতটা স্থিতাবস্থার স্বার্থবাহী দল বা দলসমূহের প্রচার করবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা।

প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় আগে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ নোম চমস্কি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, সংবাদমাধ্যমগুলি বিশ্বপুঁজিবাদের ঘনীভূত সংকটমোচনে নির্দিষ্টভাবে শাসকদের তল্পিবাহকে পরিণত হয়ে চলেছে। এরা কোনওভাবেই বিরোধী কোনো মতামতকে জনসমক্ষে আসতে দেবে না। আন্তর্জাতিক পুঁজিব্যবস্থার স্থায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বড় প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি মেনে নেওয়াই সম্ভব নয়।

চমস্কির পরামর্শ ছিল, গণতন্ত্রে প্রত্যয়শীল বামমনস্ক রাজনৈতিক দলগুলির উচিত অনতিবিলম্বে নিজস্ব বৈদ্যুতিন মাধ্যম নির্মাণে যত্নশীল হওয়া। তাঁদের কথা সাধারণ জনসমাজের কাছে পৌঁছতে হলে অন্য কোন বিকল্প নেই। মূলধারার গণমাধ্যমগুলি কোনভাবেই প্রগতিবাদী ভাবনাগুলি আলোচনার মুখ্য পরিসরে আসতে দেবে না। মানুষ প্রতারিত হয়েই চলবে। দুই দল দুর্বৃত্ত একে অন্যের সঙ্গে কপট প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচার করবে। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রবল তাগিদে তারা অগণিত অপকৌশলের আশ্রয় নেবে। স্থিতাবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক শক্তিগুলি মাথা খুঁড়ে মরবে। তাঁদের আবেদন মানুষের কাছে পৌঁছবে না। কোন প্রতারক আগামী কিছুকালের জন্য জনসাধারণকে শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট করবে তা, জনসাধারণই নির্ণয় করবেন। গণতন্ত্রের অপার মহিমা!

উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র যে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশগুলির প্রগতিপন্থী আন্দোলন ও প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটানো সংগঠনগুলি নোম চমস্কির অতি মূল্যবান পরামর্শগুলি বাস্তবায়িত করতে পারে নি। কারণ, মুখ্যত প্রবল অর্থাভাবের জন্যই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমক বিশেষ করে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব হয় নি। একটি বা দুটি দৈনিক সংবাদপত্র বা সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করতেই হিমশিম! ভারতের বহু সংখ্যক রাজ্যে তা-ও প্রায় নেই বললেই চলে। সম্ভবত কেরালা বাদ দিলে অন্য কোথাও প্রগতিপন্থীদের সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতি মনোযোগী গ্রাহক সংখ্যাও সেভাবে বিস্তার লাভ করে নি। ফলস্বরূপ, সমাজপ্রগতির কার্যক্রমে যুক্ত বহু মানুষের নিজেদের বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ করা ও তা, জনসমক্ষে পৌঁছে বিশেষ প্রভাব বিস্তার সম্ভব হচ্ছেই না। আবার একথাও সত্য শুধু যারা অর্থবলে বলীয়ান হয়ে কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছে তারাও সঠিকভাবে ভাবাদর্শ তুলে ধরতে পারছে কিনা তা নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন। সবটা অবান্তর নাও হতে পারে।

লাতিন আমেরিকায় বামপন্থী বা উদার গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ প্রসারে একদা কিউবা, ভেনেজুয়েলা, উরুগুয়ে, বলিভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেভাবে গণমাধ্যমগুলিকে যথাযথ পথে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা, বিশেষ তাৎপর্যবাহী। 'একুশ শতকের সমাজতন্ত্র' প্রসঙ্গে অনেকে নানা কূট প্রশ্ন তুললেও স্বীকার করতেই হবে যে, অদূর অতীতে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের আগ্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করতে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার সুফল এখন অনুভূত হচ্ছে। মার্কিন রাষ্ট্রের বর্বরতাপূর্ণ ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র এখনও ভেনেজুয়েলায় ফলপ্রসূ হতে পারে নি। কিউবা অনেকটা উন্নতশির থাকতে পেরেছে। বলিভিয়ায় ইভো মোরালেসকে নির্মমভাবে দেশত্যাগে বাধ্য করেও ওই দেশে পুনর্বার অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। এমনকি, ব্রাজিলের মতো বিশাল বড় দেশেও ব্যাপক ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়েছে। যেসব অলীক ও সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে ওই দেশের শ্রমজীবী মানুষের নেতা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ইনাশিও দা সিলভা দা লুলাকে কারান্তরাল থেকে মুক্ত করা গেছে। সুদূর ১৯৭৩ সালে দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যন্ত দক্ষিণাংশের রাষ্ট্র চিলিতে যে নৃশংস গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল তার ভয়াবহ স্মৃতি কাটিয়ে উঠে মানুষ আরও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অগ্রসর হচ্ছেন এসবও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

লাতিন আমেরিকা জেগে আছে বিপুল সংখ্যক মানুষের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধিতার শপথ বুকে নিয়ে। আন্তর্জাতিকস্তরে ওই দেশগুলির সংবাদ চেপে দিলেও বিশ্বের অন্যান্য অংশের প্রতিবাদী মানুষদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যাচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশকে যেমন নির্বৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন অসভ্য জাতি সমূহের বাসভূমি বলে দীর্ঘ বহু শতাব্দী সাধারণের দৃষ্টিগোচর হতে দেওয়া হয়নি, প্রায় সেভাবেই লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকেও লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দেবার অপচেষ্টা ছিলই। মুখ্যত নিজস্ব গণমাধ্যমগুলির ব্যাপক বিস্তার এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে যাবার অকুতোভয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

লাতিন আমেরিকার বহুদেশের এই সাফল্য কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তবে ওই মহাদেশের অংশত ব্রাজিল ব্যতীত সবকটি দেশের ভাষাগত ঐক্য অর্থাৎ স্প্যানিশ ভাষার ব্যবহার বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। আর একটি প্রসঙ্গও উল্লেখ্য, সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে মুখ্যত মানুষের ধর্মবিশ্বাসগত কোনো প্রভেদ নেই। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক হানাহানির কোনো সুযোগই নেই। এই দুটি বিষয় সম্ভবত মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে বিশেষ অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

আমাদের মতো বিশাল দেশে তা সম্ভব নয়। মূলত ভাষা ও ধর্মবিশ্বাসগত এত প্রভেদ একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়। আমাদের দেশে সর্বজনবোধ্য কোনো একটি ভাষা নেই। সংস্কৃতিগত পার্থক্যও বেশ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এদেশে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্মেষকাল থেকেই আঞ্চলিক বৈষম্য বেশ গভীর। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' শব্দগুলি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে তার বাস্তব প্রয়োগ ততটা সহজ সরল নয়। ধর্মবিশ্বাসগত প্রভেদও বিদ্যমান। এত বেশি সংখ্যক ধর্মমত বিশ্বের অন্য কোথাও নেই। একদা সোভিয়েত মহাসংঘ নামক যে রাষ্ট্রটি দুনিয়ার মজুর কিষাণ বা ব্যাপক অর্থে দারিদ্র অংশের মানুষদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনাময় জীবনবোধ নির্মাণে অংশেষ সাফল্যলাভ করেছিল সেই সুবিশাল রাষ্ট্রে এই সমস্যা বেশ জটিল ছিল। ওই দেশের সাধারণ মানুষদের অংশেষ সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, ভ্লাদিমির লেনিনের মতো একজন অনন্য দার্শনিক বিপ্লবী উদারমনস্ক রাষ্ট্রনেতাকে তাঁরা একসময় পেয়েছিলেন।

১৯১৭র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সামান্য কিছুকাল তিনি জীবিত ছিলেন। সেইটুকু সময়কালেই জাতিসত্তার প্রশ্নে তাঁর অপরিসীম বোধিজাত সিদ্ধান্তগুলি এক অপরূপ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল। একান্তভাবে তাঁরই উদ্যোগে রুশ দেশীয় আধিপত্যবাদী মননের বিলুপ্তি সাধনে দেশটির নামকরণে কোথাও রুশিয়োর নামটিও উচ্চারিত হয় নি। 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মহাসংঘ' জাতিগত পার্থক্য বা প্রভেদ মোচনে একটি অসাধারণ তাৎপর্যবাহী উদ্যোগ। অতি জাতীয়তাবাদের অভিশাপ আজও বহু সংখ্যক দেশের মানুষকে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভাজিত করে রাখতে পারছে।

আমাদের দেশে পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থার বিকাশ হলেও সমাজ সংস্কৃতির সাযুজ্যপূর্ণ বিকাশ আদৌ সম্ভব হয় নি। বহু প্রাচীন সংস্কার বা কুসংস্কার এখনও জনমানসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। ধর্মবিশ্বাসগত প্রভেদ একটি অনতিক্রম্য অভিশাপ হিসেবেই প্রকট। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই আকুতিপূর্ণ প্রার্থনা "ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত"। বাস্তবে এতকাল পরেও আর রূপায়িত হলই না। যে মানবিক ঔদার্য এবং মহামিলনের বার্তা তিনি বারংবার উচ্চারণ করেছেন সমগ্র জীবনব্যাপী তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতেই অক্ষম ভারত। শুধুমাত্র আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় দার্শনিক ও কবিই নন, আরও বহু মনীষীই নানাভাবে এই ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভাবাদর্শ উল্লেখ করেছেন। দেশের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রবল গণআন্দোলনের পরিসরেও বহুভাবে এমন ভাবাদর্শের প্রতি অন্বিত থাকার বার্তা সন্ধান করতে অনেক গভীর চর্চার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের অশেষ লজ্জা ও অধোবদন হওয়ার বিষয় যে, এ দেশটিতে উন্নত চিন্তা ও বোধের পক্ষে জনগণের ব্যাপক অংশকে উদ্বেলিত করা আন্দোলনের অনুপস্থিতির জন্য বিপরীত বোধই এখন প্রবল আকার ধারণ করে মানবিক বোধকেই চ্যালেঞ্জ করবে।

বাস্তবে, ভারতের অতি মলিন অর্থনৈতিক অবস্থা সাতিশয় দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। বহু মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান বা সসম্মান জীবনধারণের প্রশ্নটি ভয়ংকরভাবে বিপর্যস্ত। কর্মহীনতার অভিশাপ আরও প্রবলভাবে দেশের সাধারণ জীবনকে অশেষ যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু সবকিছুর ওপরে মানবিক বোধ প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। বহু মানুষ এমন অভূতপূর্ব ক্লিষ্ট সময়েও ধর্মবিশ্বাসগত চিন্তায় প্রভাবিত হচ্ছেন। এই অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি না পেলে তা, মনুষ্যসভ্যতার উন্নততর রূপকেই বিকারসম্পন্ন বিদ্রুপ করে যাবে।

১০ এপ্রিল ভোটে শিতলকুচিতে সি আই এস এফ-এর নৃশংসতা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের চতুর্থ পর্যায়ের ভোটগ্রহণ পর্ব রক্তাক্ত হয়ে পড়ল। কুচবিহারের শিতলকুচিতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর আক্রমণে চারজন তরুণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ভোটগ্রহণের শুরুতেই এই কেন্দ্রের ভ্যাটাবাড়িতে ১২৬ নং বুথে পাহারারত সুরক্ষাবাহিনীর গুলিতে চারজন নিহত। প্রত্যেক মৃতদেরই গলায় এবং বুকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তার আগেই একজন ১৮ বছর বয়সী তরুণকেও হত্যা করা হয়। সব মিলিয়ে পাঁচজন মানুষ নির্দয়ভাবে নিহত।

ঘটনার যতটুকু বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এতগুলি মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করার আগে সি আই এস এফ বাহিনীর হত্যাকারীরা একবারের জন্যও শূন্যে গুলি ছুঁড়ে সচেতন বা সাবধান করে নি। হাঁটুর নীচে আঘাত করে তাঁদের চলচ্ছক্তিহীন করা হয়নি। সমস্ত নিয়মের উল্লঙ্ঘন করে সরাসরি হত্যার উদ্দেশ্যেই গুলি চালানো হয়েছে। এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড অতীতে কখনোই সংঘটিত হয় নি। আচমকা আক্রমণে বুথের মানুষজন বা সংলগ্ন গ্রামের মানুষরা হতচকিত হয়ে পড়েন। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের মতো চরম নৈরাজ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত রাজ্যে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর সহায়তা জরুরি ছিল। কিন্তু তার অর্থ এমন হতেই পারে না যে, বাহিনীর কর্মীরা অযথা হত্যালীলায় মেতে উঠবে। রক্তরঞ্জিত করে তুলবে বাংলার মাটি। তাদের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ অবশ্যই নিন্দার্হ। মৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল বা কী ছিল না তা আদৌ বিবেচ্য নয়। মানুষ বিশেষত, অল্পশিক্ষিত অসচেতন দরিদ্র অংশের পাঁচজনের মৃত্যু কোনো হিসাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

সংযুক্ত মোর্চার নেতৃবৃন্দ ১১ এপ্রিল সকলেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে পৌঁছে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা সমস্বরে শিতলকুচির অঘটনের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই তদন্ত অনতিবিলম্বেই সমাপ্ত করে সত্য প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা এস পি'র রিপোর্ট নিতান্তই সত্য গোপন করে দোষীদের আড়াল করার প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছুই নয়।

এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান কম. বিমান বসু, জাতীয় কংগ্রেসের নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, আব্দুল মান্নান; আই এস এফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী, সি পি আই নেতা কম. প্রবীর দেব, সি পি আই (এম) নেতা কম. রবিন দেব, আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে হিংস্র সাম্প্রদায়িকতামূলক উস্কানি দেওয়া বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ, সায়ন্তন বসু, রাহুন সিনহা প্রমুখর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এইসব নেতারা নির্বাচনী বিধি নস্যাৎ করে রাজ্যের মানুষকে সাম্প্রদায়িক পথে মেরুকরণের জঘন্য অপচেষ্টা করছেন। এরা সমস্বরে এই নিষ্ঠুর হত্যার পক্ষে কথা বলে চলেছেন এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার কুৎসিত ষড়যন্ত্র করছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাও নিন্দনীয়। তাঁকে যদি ২৪ ঘণ্টার জন্য নির্বাচনী প্রচার থেকে বিরত করার সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন নিতে পারে তাহলে একই দোষে দুষ্ট বিজেপি নেতারা ছাড় পাবেন কেন?

রাসায়নিক সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক দ্বিমাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণা করার সময় সারাদেশে যে হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে তা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মনে রাখতে হবে, দেশের সর্বোচ্চ ব্যাংক পরিচালনায় এখন আর রঘুরাম রাজনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোনো অর্থশাস্ত্রী নেই। এমনকি, উর্জিত প্যাটেলের মতো নামী অর্থনীতিবিদও নেই। মোদী জমানায় এমন সব গুণী মানুষদের অপমান করে বিদায় করা হয়েছে। প্রয়াত অরুণ জেটলির 'অর্থমন্ত্রীত্বকালেই এমন সব অনৈতিক কাজ দেশের সামূহিক ক্ষতি করেও হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের পরিবর্তে মোদী সরকার অতি আস্থাভাজন এক উচ্চপদস্থ আমলা শক্তিকান্ত দাসকে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। তিনি ইতিহাসে স্নাতকোত্তর। শুধুমাত্র এক ঘৃণ্য স্বৈরাচারী সরকারের আর্থিক নীতি সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করবেন না, এটাই ছিল মুখ্য বিষয়।

সেই শক্তিকান্ত দাস নেতৃত্বাধীন রিজার্ভ ব্যাংক জানাচ্ছে যে, পেট্রোল ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বা রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি আতঙ্কজনক। সমস্ত কৃষিপণ্যের দামও উর্ধমুখী। এই অবস্থার মধ্যেই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই রাসায়নিক সারের দাম ৫৮ শতাংশ বেড়ে গেল। মোদী সরকার সারে ভরতুকি কমানোর জন্যই এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী কুপ্রভাবে সমস্ত কৃষিপণ্যের দাম আগামীদিনে নিদারুণ ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সারা ভারত সংযুক্ত কিসান সভা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কম. সুভাষ নস্কর কেন্দ্রীয় সরকারের এমন জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয় সর্বজনবিদিত যে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নির্দেশে এবং নয়া উদারবাদী প্রকল্প বাস্তবায়িত করার তাগিদে রাসায়নিক সার উৎপাদক সরকারি কোম্পানিগুলিকে নির্বিচারে বেসরকারিকরণ করা হয়েছিল। তখন অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার। ২০০৩ সাল। বামপন্থীদের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই এই অনৈতিক কাজ হয়েছিল। মোদী সরকারের আমলে বেসরকারি পুঁজি মালিকদের অঢেল মুনাফা সুসাধ্য করা সমস্ত প্রচেষ্টাই চলছে। নগ্নভাবে বড়লোকদের আরও বড়লোক করে দেবার ধারাবাহিক পরিকল্পনা করে যাচ্ছে মোদী সরকার। সারের ওপর থেকে ভরতুকি প্রত্যাহার মূলত সেই লক্ষ্যেই। কৃষিক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়ায় এক অসহনীয় অবস্থা হবে।

বাম মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে দাবিপত্র পেশ

গত ১৩ এপ্রিল রাজ্যের বামপন্থী মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রাজ্যে চার দফায় ভোট সম্পন্ন হয়েছে, প্রতিটি দফায় বিশেষ করে ১০ এপ্রিল যেভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি হিংসাত্মক চেহারা নেয়, সেই বিষয়গুলি তুলে ধরেন। শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলই নয় নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় আধাসামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রিক হিংসায় নিহত পাঁচটি প্রাণের বলির বিষয়টি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ। শুধু তাই নয়, যাদবপুর কেন্দ্রে মহিলা পোলিং অফিসার দীপ্তি লাহিড়ী এবং বিপাশা মণ্ডলকে চরম হেনস্থা করা হয়েছে। চোখে লঙ্কার গুঁড়ো, চোখে আঘাতের মতো অমানবিক কাজ করতেও দ্বিধা করেনি দুষ্কৃতীরা।

বাম মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনটি মুখ্য দাবি পেশ করা হয়।

১. দীপ্তি লাহিড়ী এবং বিপাশা মণ্ডলকে যে দুষ্কৃতীরা হেনস্থা করেছে তাদের শনাক্ত করে অভিযুক্ত করতে হবে।
২. রাজ্যে সমস্ত মহিলা এজেন্ট সহ পোলিং এজেন্টদের নিরাপদে বুথে বসার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. নির্বাচনের কাজে যুক্ত পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে।
৪. প্ররোচনা এবং উস্কানি বন্ধের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৫. বাড়ি ফেরার শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাম মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন কম. কনীনিকা ঘোষ, কম. করুণা সেনগুপ্ত, কম. পারমিতা দাশগুপ্ত, কম. সমিতা রায়চৌধুরী, কম দীপা চক্রবর্তী ও কম. সর্বানী ভট্টাচার্য।

বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ৫ টাকা

কর্পোরেট স্বার্থে তৃণমূল ও বিজেপি'র ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে মানুষের স্বার্থে বামগণতান্ত্রিক ঐক্য সুদৃঢ় করুন

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ১০ টাকা

বামপন্থা-সেকাল একাল

—মনোজ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

—— দাম ১৫ টাকা——

অবিলম্বে সংগ্রহ করুন

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ উপলক্ষে দূরদর্শনে আর এস পি রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ চৌধুরীর বক্তব্য

নমস্কার

সুধী নাগরিকবৃন্দ, দেশ ও রাজ্যজুড়ে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং ক্ষুধা ও চরম বেকারত্বের যুগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ঐ নির্বাচনের প্রাক্কালে আর এস পি'র পক্ষে কয়েকটি কথা রাজ্যের সংবেদনশীল ও বিবেকবান নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে উপস্থাপন করছি।

সম্মানীয় বন্ধুগণ, আর এস পি মনে করে যে, পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রের সরকারে আসীন থাকা রাজনৈতিক শক্তি দুটি আজ মিথ্যাচারিতা ও স্বেচ্ছাচারী মানসিকতায় এমনভাবে সরকার পরিচালনা করছে যার ফলে রাজ্যের ও দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোটি পুরোপুরি ধ্বংসের মুখোমুখি। আমরা বিশ্বাস করি যে, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও মানবতার যে শিক্ষা আমরা পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে আত্মস্থ করেছি, তৃণমূল ও বিজেপি তা সমূলে উৎপাটন করার অপপ্রয়াস চালিয়ে চলেছে। সহিষ্ণুতা, উদারতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবতার ঐ শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই এই রাজ্যের ছাত্র-যুব সমাজ সহ সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষকে তৃণমূল ও বিজেপি'র ঐ অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতেই হবে।

তথ্য ও পরিসংখ্যান যতটুকু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে আমরা মনে করি যে, ২০১৬ থেকে ২০২১-এর আজকের তারিখ পর্যন্ত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে ঐ বিপর্যয়ের জন্য কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দুই সরকারই দায়ী। মাননীয় নাগরিকবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের দৌরাত্ম্যে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ তো হচ্ছেই। বেড়ে চলেছে দুর্নীতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজের অত্যাচার। পেট্রোপণ্য সহ সকল জিনিসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, পুলিশ-প্রশাসন সহ সকল প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করা, বেকার যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, শিল্পে বিনিয়োগ না হওয়া, জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করা, লকডাউন কালে বিপর্যস্ত জনজীবনকে স্থিতিশীল করার উদ্যোগহীনতা ইত্যাদি নানান কারণে আজ দেশ ও রাজ্যের জনজীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। কার্যত এক নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। আজ এটা প্রমাণিত যে, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয়েই দুর্নীতিকে সযত্নে লালন-পালন করে চলেছে। সারদা, নারদা সহ বিভিন্ন দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই হয় তৃণমূলে নতুবা বিজেপিতে বহাল তবিয়তে নেতৃত্বে আসীন রয়েছেন এমনকি, অনেকেই আসন্ন নির্বাচনে হয় তৃণমূল বা বিজেপি প্রার্থীও হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে দল বদলের সংস্কৃতিকেও এই দুই রাজনৈতিক দল আমদানি করেছে। সুধীবৃন্দ, আজ বাংলার ঘরে ঘরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে শক্তিশালী করা আবার বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অর্থ তৃণমূলকে শক্তিশালী করা। একে অন্যের পরিপূরক। আর এস পি মনে করে যে, আজ দেশ ও রাজ্যের সরকার যে নীতিতে সরকার পরিচালনা করছে তা নয়া-উদারবাদী অর্থনীতিরই উদগ্র অনুসরণ।

বন্ধুগণ, আমাদের রাজ্য আজ তীব্র আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার বাজার থেকে ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ধার করে সাংবিধানিক রীতি নীতিকে তোয়াক্কা না করে ক্লাব, পূজা কমিটিগুলিকে দান খয়রাতি করে তাদের দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করতে যতটা তৎপর থেকেছে করোনাকালে সেই ধার করা অর্থের সাহায্যে রাজ্যের জনজীবনকে রক্ষা করতে ততটাই নিস্পৃহ থেকেছে। অথচ, লক ডাউন চলাকালীন সময়ে বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ জনগণের সম্মানজনক জীবনযাপনের লক্ষ্যে তাদের সকলকে নগদ অর্থ জোগানের নিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকারকে সেই বিষয়ে মান্যতা দিতে দেখা যায়নি। ফলতঃ রাজ্য সরকারের ঐ অপরিণামদর্শী মনোভাবের কারণে পশ্চিমবঙ্গবাসী অনর্থক ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় আসুন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় সেই শক্তিকেই নির্বাচিত করি—

যারা, আমাদের রাজ্যকে অযথা ঋণগ্রস্ত করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে না, রাজ্য সরকারের সকল শূন্যপদে কর্মপ্রার্থীদের স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করতে টালবাহানা করবে না, দেশব্যাপী কৃষক শ্রমিকদের দেশের সরকার যে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে তা থেকে রাজ্যের জনগণকে মুক্ত করতে সদর্থক ভূমিকা নেবে, ছাত্র-যুবদের স্বার্থে অবসরপ্রাপ্তদের পুনঃনিয়োগ করবে না, প্রতি বছর শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষক নিয়োগে, রাজ্য সরকারের সকল শূন্যপদে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগে নিয়মিত তৎপর থাকবে, সকল বেকারের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থানকে প্রচারের ঢক্কানিনাদে সীমাবদ্ধ না রেখে কার্যত অগ্রাধিকার দেবে। সরকারী ক্ষেত্রে সমকাজে সম-মজুরির ব্যবস্থা করবে, চুক্তি বা ঠিকা প্রথায় নিযুক্তদের স্থায়ীকরণ করবে। চাকুরি দেবার ক্ষেত্রে যে ভয়ংকর দুর্নীতি চলছে তার অবসান হবে। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা নিয়ে কোনো আপস না করে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মিনিমাম সার্পোট প্রাইস দিতে তৎপর থাকবে ও কৃষিজীবি, কৃষিকাজে যুক্ত ক্ষেত-মজুরদের জীবন-জীবিকাকে বিপন্ন হতে দেবে না। কেন্দ্রের নয়া কৃষি আইনের বিকল্প আইন রাজ্য প্রণয়ন করতে তৎপর হবে, সংশোধিত বিদ্যুৎ বিল, ২০২০ চালু করার পরিবর্তে অন্তত ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি দেওয়ার উদ্যোগ নেবে ও অসংগঠিত, পরিযায়ী শ্রমিক সহ সকল জনসাধারণের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। ব্যাঙ্ক, বীমা সহ দেশের সকল লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তকে প্রতিহত করতে সংগ্রামের হাতিয়ারের ভূমিকা নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। দৈনিক ৭০০ টাকা ন্যূনতম বেতন হিসেবে চালু করার প্রয়াস নেবে। বন্ধ চা বাগানগুলি খোলার জন্য করণীয় কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করবে। চা বাগানগুলিতে বসবাসকারী সকল শ্রমিকদের বাড়ি ও জমির অধিকার নিশ্চিত কববে। চা বাগানে পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সুষম খাদ্য নিয়মিত সরবরাহ করার যাবতীয় সমস্যা দূরীকরণে স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কারণ, চা বাগিচার অর্থনীতিকে না বাঁচাতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের বিপন্নতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিমবাংলায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে তৎপর থাকবে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিল্পায়ন, নগরায়নে সামিল হবে। জুট মিলের সাথে যুক্ত কয়েক লক্ষ শ্রমিক ও পাটচাষীকে বাঁচিয়ে রাখতে যখন তখন মালিকপক্ষের জুট মিল বন্ধ করে দেওয়ার প্রবণতাকে রুখতে সদর্থক ভূমিকা নেবে।

সকল ধর্মের সঙ্গে নিরপেক্ষ সম্পর্কের অবস্থান গ্রহণ করে চলবে। ধর্মের সঙ্গে রাজ্যের সরকারি নীতি এক করে ফেলবে না। মাননীয় সুধীবৃন্দ, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি হল নয়া উদারবাদী লুঠেরা পুঁজির ভাবাদর্শ বাহিত নীতি নৈতিকতার বাঁধনহীন রাজনৈতিক শক্তি। এদের পরাস্ত করতেই হবে। সমস্ত ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করুন এবং যে সকল কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত বামফ্রন্টের আর এস পি প্রার্থীরা যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেখানে তাদের কোদাল-বেলচা চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়ী করুন। অন্যত্র বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির জয়কে সুনিশ্চিত করুন। আগামী দিনে সংযুক্ত মোর্চাই আপনাদের সমর্থনে রাজ্য সরকার গঠন করবে।

করোনা সংক্রমণ আবার ভয়াবহ হয়ে উঠেছে

কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ এক ভয়াবহ আকারে ভারতের জনজীবন আতঙ্কিত করে তুলেছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত এমন কি পশ্চিমবঙ্গেও সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে সাবধানতা অবলম্বন ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়মাবলী অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত। তার ওপর হরিদ্বরে কুম্ভমেলা। লক্ষ লক্ষ মানুষের উন্মাদনাপূর্ণ অংশগ্রহণ। কোন নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই অসংখ্য ভক্ত উন্মাদপ্রায় নারী পুরুষের পূণ্যলোভে কাতর হয়ে গঙ্গাবঙ্গে ঠেলাঠেলি। এসব ছবি দেখেই আতঙ্কিত হতে হয়। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তবলিগী জামাতের ওপর সংক্রমণ ছড়ানোর দায় চাপানোর কৌশল নিয়েছিল। উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রসার কিছুটা হলে সফল হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ আরও ভীতিজনক হয়ে উঠছে। যে সংখ্যায় সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উন্নয়ন আশা করা গিয়েছিল তা, আদৌ হয় নি। ভেন্টিলেটারের অপ্রতুলতা বেশ আশংকার বিষয়। এমন কি, মুমূর্ষু রোগীদের অক্সিজেন বাইপ্যাপের সাহায্যও মিলছে না। সর্বত্রই হাসপাতালগুলিতে শয্যা অমিল। মোদীর অসাধারণ উন্নয়ন সম্ভব করার অতিকথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যার বেসাতি তা, ওই রাজ্যের বড় শহরগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে লক্ষ করলেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। গুজরাতের রাজধানী শহর আহমেদাবাদ (গান্ধিনগর), রাজকোট বা ভদোদ্রার মতো শহরগুলিতেও কোভিড চিকিৎসা এক চরম ব্যর্থতার মধ্যে। সদ্য অভিজ্ঞতায় এক গুণী অধ্যাপক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসহায় মৃত্যু সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও হাসপাতালে শয্যা মেলেনি। অ্যাম্বুলেন্সের প্রবল দুষ্প্রাপ্যতা। ব্যাইপ্যাপ অক্সিজেন দেবার সামান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যায় নি। বেঘোরে প্রাণ গেল একজন অতি জ্ঞানী গবেষক ও শিক্ষকের।

আরও আতঙ্কিত হবার প্রসঙ্গ কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত ব্যক্তিদের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছে। কোভিড নিয়মাবলী মেনে শ্মশানগুলিতে গড়ে ১৬-১৭টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে শোকগ্রস্ত আত্মীয়স্বজনকে। মৃতদেহের পাহাড় জড়ো হচ্ছে। কবে কতক্ষণ অধীর অপেক্ষায় থাকতে হবে তার কোনো নির্দিষ্ট আশ্বাসও রাজ্য সরকার দিতে পারছে না। সরকার অতিব্যস্ত মৃতের সংখ্যা গোপন করতে। সুরাট সহ অন্যান্য হাই-ফাই শহরগুলিতেই এমন দুর্দশা। গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরেও করোনায় মৃতদের যথাযথ মর্যাদাসহ অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। সংবাদে প্রকাশ ওই রাজ্যেও মৃতদেহের পাহাড় জমে যাচ্ছে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী আকুল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে অবিরাম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে চলেছেন। ভাবতে ঘৃণা বোধ হয় যে, ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধহীন এক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা নির্ভর ব্যক্তি তাঁর সঙ্গী সাথীসহ সামূহিক সর্বনাশের শবসাধনায় মত্ত।

পশ্চিমবঙ্গেও যে আগ্রাসী রূপে কোভিড সংক্রমণ দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে ঠিক ঠিক মোকাবিলা করার ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েই আছে। শুধু সাদা-নীল রঙ করা অট্টালিকা হলেই জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়না—এই সরল সত্যটি রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারগুলিকে গণআন্দোলনের দাপটেই বুঝিয়ে দিতে হবে।

বামপন্থী দলগুলি বা বৃহত্তর অর্থে সংযুক্ত মোর্চা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ১৪ এপ্রিলের পর থেকে আর বড় কোনো নির্বাচনী সভা সংগঠিত হবে না। সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা বিশেষভাবে বামপন্থীরা বহন করে। তাঁদের কাছে নির্বাচনে জয়লাভই শেষ কথা নয়। সুতরাং তাঁরা এমন অভিনন্দনযোগ্য সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। রাজ্যের সাধারণ মানুষকে করোনার কোপ থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব বিজেপিমূলীরা কোনকালেই নেবে না।

Vol. 68 Issue No. 33 শনিবার ১০ এপ্রিল '২১, ১৭ এপ্রিল ২০২১ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে দূরদর্শনে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে আর এস পি নেতা নির্মল দাসের বক্তব্য

গত দশ বছর পূর্বে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনের অবসানে তৃণমূল দল রাজ্য শাসনের সুযোগ পায়। তারা রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে সুশাসন, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমর্থন লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেত্রীর স্বেচ্ছাচারী বেপরোয়া অপশাসনে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন। শাসকদলের নেত্রী তাঁর অনুগত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। রাজ্যের সমস্ত পরিসরে চরম নৈরাজ্য বিরাজমান। ব্যক্তি শাসনের অঙ্গুলিহেলনে তাঁর অনুগত জঘন্য প্রকৃতির দুর্বৃত্তের দঙ্গল ভিন্ন কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য জন্য অনবরত হিংস্র আক্রমণ করে চলেছে। প্রশাসন নির্বিকার নীরব দর্শক। রাজ্যের সামাজিক মূল্যবোধ ক্রমাগত আক্রান্ত, সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার মুখে। সীমাহীন লজ্জার বিষয়, একদা পশ্চিমবঙ্গের মতো মূল্যবোধ সম্পন্ন রাজ্যেও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে দিনের পর দিন। এমনিতেই মোদি সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমগ্র দেশের নারী সমাজই বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার। সামাজিক ভারসাম্য আজ বিপর্যস্ত। শুধু তাই নয়, দুই সরকারই দেশের বহুত্ববাদী সংবিধানের চরিত্র ধ্বংস করতে উদ্যত।

রাজ্যের অর্থনীতি ভয়ঙ্করভাবে বিধ্বস্ত। সীমাহীন জাঁকজমক ও বাগাড়ম্বর পূর্ণ চমক দিয়ে শিল্প বিনিয়োগের নামে চলছে কর্পোরেট জগতের মহারথীদের তোষণ। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত শাসক গোষ্ঠী। বন্ধ জুটমিল এবং শিল্পকারখানাগুলিতে উৎপাদন বন্ধ। তৃণমূল কংগ্রেসের সশস্ত্র বাহুবলীদের দৌরাত্ম্যে এবং তোলাবাজিতে সমাজবিরোধী সিন্ডিকেট গড়ে উঠছে সর্বত্র। দুর্বৃত্তরা পুলিশ এবং এক শ্রেণির প্রশাসকের যোগসাজশে লুণ্ঠনের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে সর্বত্র।

উত্তরবঙ্গের বহু চা বাগান বন্ধ। অনেক বাগান আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ না হয়েও ধুঁকছে। ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার জন্য কমিটি গড়া সত্ত্বেও চা শ্রমিকদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকার পূরণ করতে পারেনি।

প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়িতে এসে বলেছিলেন, চা শ্রমিকদের দুর্গতি লাঘব হবে এবং মজুরি বৃদ্ধি হবে। প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে চা শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবের কোনও ব্যবস্থা আজও হল না। মাননীয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে চা শিল্পের জন্য বেশ কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদানের কথা বললেও তা ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে একতরফা ভাবে মালিকদের সুবিধাই এনে দিয়েছিল। পার্লামেন্টে এন ডি এ সরকার দেশের মাত্র ৩ শতাংশেরও কম বেনিয়াদের মুনাফা লাভের জন্য নূতন আইন এনে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিজীবী মানুষের সর্বনাশ করেছে। গত তিনমাস ধরে কৃষক আন্দোলনে তিন শতাধিক মৃত্যু হয়েছে। অথচ সরকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় সেই আন্দোলন দমন করছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক পথে পথে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে বিজেপির নেতৃবৃন্দ এবং তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো উভয়েই চটজলদি ভন্ডামিপূর্ণ কৌশলে পটু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নিজেদের ভাবমূর্তি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেদের গৌরাবান্বিত করে চলেছেন। ভোটের বাজার গরম করতে উভয় উভয়ের বিরুদ্ধে ছদ্ম দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ। এই ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে এরা ভুলিয়ে দিতে চায় যে, উভয়েই একে অপরের পরিপূরক এবং কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের অর্থে পুষ্ট।

চিটফান্ডের কেলেংকারিতে দুই সরকারের অভিসন্ধিতেই বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অশুভ আঁতাতের বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। নারদা স্টিং অপারেশনে মমতা মন্ত্রীসভার বহু মন্ত্রী ঘুষ নেওয়ার বিষয়গুলি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রচারিত হয়েছিল। সারদা রোজভ্যালির মতো চিটফান্ডের অর্থ তছরুপের অভিযোগে দু-এক জন সাংসদ ও মন্ত্রীকে কিছুদিনের জন্য কারাবাসও করতে হয়েছে। তাঁরা অনেকেই এখন দলবেঁধে বিজেপি'র শিবিরে ভিড় করেছে।

রাজ্যবাসী, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে গণতান্ত্রিক সংস্থা ও কাঠামোগুলি নির্বিচারে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে তারই অভিনব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে একজন আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক তথা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চরম স্বেচ্ছাচারীর শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আর এস এসের একান্ত অনুগত এক প্রচারক। গুজরাটের প্রাক্তন এই মুখ্যমন্ত্রী ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত গুজরাটে যে সন্ত্রাসের আগুন, গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল তিনিই ছিলেন তার মূল স্থপতি।

মোদি সরকারের অশুভ অর্থনৈতিক প্রকল্পের নীল নকশা বিমুদ্রাকরণ। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংবিধান প্রদত্ত স্বাধিকার লঙ্ঘন করে বিমুদ্রাকরণের মাধ্যম জাতীয় জীবনে গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে আনে কেন্দ্রীয় সরকার। ৮৬ শতাংশ নানান মূল্যমানের নোট বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম উদ্দেশ্য এবং দুরভিসন্ধি ছিল নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল এবং স্ফীত করা। কালো টাকা উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি কথার কথাতেই থেকে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের অপশাসনে বেকারত্ব, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি তথাকথিত উন্নয়নের অলীক প্রতিশ্রুতি 'সব কা সাথ সব কা বিকাশে'র নগ্ন চিত্র ফুটে উঠেছে. সমাজ কল্যাণের নামে কৃষক শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড আজ সর্বজনবিদিত। করোনা কালে ইতিমধ্যে ২০ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধিতে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কাশ্মীরের মানুষের স্বশাসনের অধিকার কেড়ে নেওয়া, সি এ এ, এন আর সি, এ পি আর-এর মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি, জাতীয় সংহতি বিরোধী কর্মকাণ্ডে জনজীবন এবং দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। দেশের অগণিত নাগরিককে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বন্দিজীবনে বাধ্য করা হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি সরকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি'র নেতারা এসে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

নির্বাচনী প্রচারে পরস্পরবিরোধী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মুখোশধারী প্রচারকরা কুৎসিত শব্দ প্রয়োগ করে প্রতিনিয়ত রাজ্যে অপসংস্কৃতির আবহ নির্মাণ করছে। অতীতের রাজনৈতিক নেতাদের মূল্যবোধের শিক্ষা ভাষা প্রয়োগের ঐতিহ্য ও শালীনতা নির্বিচারে লঙ্ঘন করে চলেছেন তাঁরা। আমাদের বিশ্বাস রাজ্যবাসী তথা নির্বাচকমণ্ডলী-এর বিরুদ্ধে তাদের সুচিন্তিত মতামত ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্ত করবেন।

সংযুক্ত মোর্চার বামফ্রন্টের আর এস পি'র প্রার্থীরা সাধারণ মানুষের কাছে পরীক্ষিত জীবনসাথী। তাঁরা কখনও অসত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং যা সম্ভব নয় সেই সব মনভোলানো লোক ঠকানো কথা বলে মানুষের সমর্থন চায়নি। রাজ্যের মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ, জাতীয় সংহতি, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা মুক্ত পরিবেশ, সম্প্রীতি সংহতি সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজ্য বিধানসভা নাটকের আখড়া নয় সঙ্গীত চর্চার কোনও স্টুডিও অবশ্যই নয়। যাদের সাথে মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার যোগ নেই তাদের নাটকীয় গিমিকে না ভুলে মানুষের অধিকার রক্ষা এবং সম্প্রসারণের কাজে যারা ব্রতী তাঁদেরকেই নির্বাচিত করুন। আমরা সেই আবেদন সকলের কাছে করছি।

আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যবাসী সংযুক্ত মোর্চার অন্তর্ভুক্ত আর এস পি'র প্রার্থীদের কোদাল বেলচা চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে এই দুই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে সর্বজনীন উন্নয়নের লক্ষ্যে খেটে খাওয়া ও নিপীড়িত মানুষের মঞ্চ সংযুক্ত মোর্চার সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে।

বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ উপলক্ষে আকাশবাণীতে তপতী ভাদুড়ীর বক্তব্য

পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সচেতন নাগরিকবৃন্দের কাছে আর এস পি দলের পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা উত্থাপন করতে চাইছি। এই রাজ্যের নাগরিকবৃন্দ এই সময়ে সংবিধানের সবচাইতে মূল্যবান অধিকার প্রয়োগ করতে চলেছেন। জনমত ঠিক করবে আগামী পাঁচ বছর কোন দলের হাতে থাকবে রাজ্যের শাসনক্ষমতা। দেশে এই মুহূর্তে এক গভীর সঙ্কটকাল চলেছে। কাজ নেই, বেকারত্ব অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আকাশ ছোঁয়া, গ্যাসের দাম প্রায় ৮৫০ টাকা, পেট্রোল ১০০ টাকা ছুঁইছুঁই, সরষের তেল ১৫০ টাকা। সাম্প্রদায়িক বিভাজন বেড়েই চলেছে, নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে ''লিঙ্কড ইন অপরচুনিটি ইনডেক্স ২০১৯'' সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে নারীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েই চলেছে, শুধু মহিলা বলেই কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হয়নি, বেতন বাড়েনি এমনকি চাকরিও পাওয়া যায়নি। ১৫-৫৯ বছর বয়সী মেয়েদের কেবলমাত্র ৯ শতাংশ কাজে নিযুক্ত। ২০০০ সালের পরের দশকে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৩৪ শতাংশ। ২০১১-১২ সালে হয়েছে ২৭ শতাংশ সেই হার এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশ। এই অবস্থায় রাজ্যের শাসক তৃণমূল দল এবং শাসনক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া বিজেপি দল মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে একপাশে রেখে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য তুমুল লড়াইয়ে নেমেছে। প্রতিদিন এই দুই দলের পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণের তরজা শুনতে শুনতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একদলের হাতিয়ার উন্নয়নের ফিরিস্তি তো আর এক দলের রামরাজ্য স্থাপনের প্রতিশ্রুতি। এই দুইয়ের ঠেলায় আসল অবস্থা আড়ালে পরে যাচ্ছে। এমনকি বিগত এক বছরকাল সারা পৃথিবীর সাথে পশ্চিমবঙ্গও এক অভূতপূর্ব অবরুদ্ধ সময়কে পার করেছে। যার পরিণতিতে আমরা জানি অনেক মানুষ কর্মহীন, আশ্রয়হীন হয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছেন শত শত মানুষ, ভারতবর্ষের অর্থনীতি এক বেসামাল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ক্ষমতা আগ্রাসী পশ্চিমবঙ্গের দুই প্রধান দল এই বিষয়ে কতটা ভাবিত আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। অতিমারির আক্রমণ এখনও কায়েম আছে এখনও আমরা নিরাপদ নই। ২০২১'র নির্বাচন আমাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করার একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আজকের নির্বাচনে লড়াই দেওয়ার জন্য গঠিত হয়েছে সংযুক্ত মোর্চা। বামফ্রন্ট এবং সহযোগী দল কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টকে নিয়ে গঠিত এই মোর্চা ফ্যাসিবাদী বিজেপি এবং স্বৈরাচারী তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান রাখছে। প্রত্যয়ের সঙ্গে মোর্চার প্রার্থীরা প্রচার করছেন কেমন করে তারা লকডাউনের সময় অনাহারী মানুষের জন্য অতি নামমাত্র মূল্যে পেটভরা খাবার দিয়েছেন। কেমন করে আমফানে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। একই সঙ্গে মোর্চার প্রতিশ্রুতি বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার, এস এস সি এবং পি এস সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়মিত নিয়োগের ব্যবস্থা করার, তিন কালা কৃষি আইন সম্পূর্ণ বাতিল করার, নাগরিক সংশোধনী আইন এবং এন আর সি'র সম্পূর্ণ বিরোধিতা করার। বাজেটে ২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার কথাও তারা বলছেন। মোর্চার প্রচার আরও বলছে নারী নির্যাতন ও গার্হস্থ্য হিংসা রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। আমরা একটু দেখি নিতে পারি করোনা উত্তরকালে পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ যে মহিলারা তাদের প্রকৃত চেহার কি?'' ''লিঙ্ক ইন অপচুনিটি ইনডেক্স ২০১৯'র সমীক্ষা বলছে ৮৫ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। ৬৬ শতাংশ মানুষ মনে করেন লিঙ্গ সাম্য বেড়েছে, প্রতি দশ জন মহিলার মধ্যে ৭ জন মনে করেন পারিবারিক কাজের জন্য তাদের কেরিয়ার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ২১ শতাংশ পুরুষ মনে করেন মহিলারা তাদের চেয়ে বেতন কম পান, ২২ শতাংশ মহিলা মনে করেন তাদের অফিসে পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, ৩৭ শতাংশ মনে করেন তারা পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পান ও সুযোগ কম পান। মানুষের জন্য মানুষের দাবিকে তুলে ধরার একমাত্র বিকল্প সংযুক্ত মোর্চা। কাটমানি, তোলাবাজি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘরভাঙ্গা, দানখয়রাতি, নাটক, কেচ্ছা এ সমস্তর উর্ধে উঠে এবারের নির্বাচনে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে, শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত আর এস পি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। নমস্কার।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-